Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামি পরিবার ব্যবস্থা : চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আয়েশা সিদ্দীকা নওশীন

রোলঃ 228021126

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামি পরিবার ব্যবস্থা : চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আয়েশা সিদ্দীকা নওশীন

রোলঃ 228021126

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আয়েশা সিদ্দীকা নওশীন " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আয়েশা সিদ্দীকা নওশীন, আইডিঃ 228021126 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামি পরিবার ব্যবস্থা : চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকার " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

আয়েশা সিদ্দীকা নওশীন

আইডিঃ 228021126

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা:

উম্মাহর প্রথম ইউনিট হলো পরিবার। মুসলিম উম্মাহ যদি একটি ইমারত হয় তবে তার ভীত হলো পরিবার। একটি শিশুর নিরাপদ আশ্রয়স্থল তার পরিবার। শিশু তার জন্মের পর মায়ের যত্নে বাবার রক্ষণাবেক্ষণে লালিত পালিত হয়। পরিবার ই শিশুর প্রথম পাঠশালা, মায়ের হাতেই সন্তানের শিক্ষার হাতেখড়ি। পরিবারের সূচনা হয় নারী-পুরুষের বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে। বিয়ে হচ্ছে পরিবার শুরুর প্রথম ধাপ। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন :

An-Nisa' 4:1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফস থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী।

"বিবাহ ইসলামের এমন এক বিধান, যা দেহ-মন-আত্মা-প্রজন্ম-সমাজ-পরিবারের সুস্থতা নিশ্চিত করে। বিপরীতে বিবাহের অনুপস্থিতি বা বিবাহ-প্রক্রিয়ার জটিলায়ন জন্ম দেয় শারীরিক-মানসিক অসুস্থতা, পরিবার-সমাজে অস্থিরতা, হতাশাগ্রস্ত অসুস্থ প্রজন্ম তৈরী করে; পশ্চিমা সমাজ যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দেখুন, ২০১৬ সালে ইউরোপ-আমেরিকার অর্ধেক শিশুর জন্ম বিবাহ-ছাড়া (out-of-wedlock)। [১] তাহলে আজ থেকে ২০/৩০ বছর পর এই শিশুগুলো যখন এডাল্ট হবে তখন পশ্চিমের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক থাকবে জারজ।

দেশ	মোট জন্মের কত শতাংশ
France	৫৯.৭%
Bulgaria	৫৮.৬%
Sweden	৫৪.৯%
Portugal	৫২.৮%
Netherlands	৫০.৪%
Belgium	৪৯%
UK	৪৭.৯%
Hungary	৪৬.৭%
Spain	৪৫.৯%

দেশ	মোট জন্মের কত শতাংশ
Ireland	৩৬.৬%
Germany	৩৫.৫%
Romania	৩১.৩%
Italy	২৮%
Poland	২৫%
Croatia	১৮.৯%
Greece	৯.৪%
USA [১]	৪৮%

আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক-দল আমেরিকার বিভিন্ন বড় বড় শহরে ১৯৯৮ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত জন্ম নেয়া ৫ হাজার শিশুর উপর গবেষণা পরিচালনা করেন। বিয়ে ছাড়া গঠিত পরিবারকে বলা হয় 'ভঙ্গুর পরিবার' (fragile families)। আমেরিকায় মোট জন্মের ৪১% শিশু এই বিয়ে-ছাড়া বাবা-মায়ের সন্তান। ফলাফলের সারাংশ হলো-

> ভঙ্গুর পরিবারে সন্তান পরিচর্যা ও সন্তানের পড়াশোনার ব্যাপারে উদাসীনতার দরুণ এসব সন্তানের-

> আইকিউ কম (lower cognitive test scores)

> আক্রমণাত্মক আচরণ

> স্কুল থেকে ঝরে পড়ার দ্বিগুণ সম্ভাবনা (ড্রপ আউট)

> সম্ভাবনা এটাই যে, এই শিশুরাও বড় হয়ে একই চক্র ঘটাতে থাকবে।

এই গবেষণা-শেষে প্রস্তাবনা দেয়া হয়, 'অবিবাহিত দম্পতি' হবার ব্যাপারে (লিভ টুগেদার) সমাজে উৎসাহ দেয়, এমন বিষয়গুলোকে আবার ভেবে দেখতে হবে বিজ্ঞানীদের। (The

study suggests that our society reconsider policies that encourage couples to remain unmarried.)

কী বুঝা গেল? বিবাহ ছাড়া সন্তান যে দেশে অর্ধেক, তাদের ভবিষ্যত অস্থির না সুস্থির? এভাবেই ইসলামের প্রতিটি বিধান আল্লাহ দিয়েছেন আমাদেরকে প্রশান্তিময় ইহজীবন ও পরজীবন দেবার জন্য। আজ পশ্চিমা বস্তুবাদী গবেষণা কীসের দিকে ইঙ্গিত করছে? যাকে তারা অপ্রয়োজনীয় মনে করে, সেই ধর্মীয় বিধানের দিকেই তো, নাকি? এই একটা বিধানকে বাধ্যতামূলক করে ইসলাম ব্যক্তিগত-পারিবারিক-সামাজিক-জাতীয়-বর্তমান-ভবিষ্যৎ মহাসমস্যাকে পাশ কাটানোর রাস্তা দেখিয়েছে। এভাবেই প্রতিটি বিধানের ক্ষেত্রে পশ্চিমা সমাজের একই চিত্রায়ন দেখানো সম্ভব।"[বিবাহ পাঠ]

শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য পরিবার কতটা জরুরী তা নিচের তথ্যগুলোর মাধ্যমে খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যায়: " সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা গেছে, ডিভোর্সড পিতামাতার সন্তানেরা শারীরিক এবং মানসিকভাবে এবং আবেগের দিক দিয়ে ভোগান্তির সম্মুখীন হয়। এ ধরনের শিশুরা বিভিন্ন ব্যর্থতা ও বঞ্চনার শিকার হয় এবং জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা আসক্তিতে জড়িয়ে পড়ে। ডিভোর্সড পরিবারের সন্তানেরা অটুট পরিবারের সন্তান দের তুলনায় অপরাধে বেশি লিপ্ত হয়।কেবল যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক কারাবন্দিই ভঙ্গুর পরিবার থেকে আসা, ডিভোর্সের কারণে শিশুর ওপর নির্যাতন অনেক বেড়ে যায়, শিশুকে অবাঞ্ছিত মনে করা হয়, তাদের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে এবং তারা আত্মহত্যা প্রবণ হয়ে ওঠে, ডিভোর্সড পরিবার থেকে আগত শিশুরা স্কুল কলেজে বাজে ফলাফল করে, অনেক সময় তাদের গ্র্যাজুয়েশনের হার ও অটুট পরিবারের শিশুদের তুলনায় অনেক কম হয়ে থাকে। এ থেকে বুঝা যায়, একটি শিশুর সুস্থ মানসিক বিকাশের জন্য সুস্থ শক্তিশালী পরিবার কত জরুরী। ইসলামী পরিবার ব্যবস্থা গঠনে বর্তমানে সেসব চ্যালেঞ্জ
রয়েছে:

পুঁজিবাদ:

[বর্তমান বিশ্বের প্রধান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা—পুঁজিবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা, ভোগবাদ ও মুনাফার নামে ধীরে ধীরে ভেঙে দিচ্ছে আমাদের সমাজের সবচেয়ে প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি: পরিবার। পশ্চিমা সমাজে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, আর আজ তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে।

নারীকে 'উৎপাদনের যন্ত্র' ভাবনা ও পরিবারবিচ্ছিন্নতা

পুঁজিবাদী অর্থনীতি নারীর শ্রমকে শ্রমবাজারে টেনে এনে তাকে পরিবারের ভরকেন্দ্র থেকে সরিয়ে দেয়। "দ্বৈত দায়িত্ব" বা Double Burden-এর শিকার হয়ে একদিকে নারীকে অফিসে পরিশ্রম করতে হয়, অন্যদিকে সংসার সামলাতে হয় একাই। যুক্তরাষ্ট্রে করা একটি জরিপে (Pew Research, 2022) দেখা যায়, ৬০% নারী মনে করেন, চাকরির চাপে তারা সন্তান ও স্বামীর সঙ্গে মানসম্পন্ন সময় কাটাতে পারছেন না।
শিশুদের বিকাশে বাধা

অভিভাবক না থাকায় শিশুদের লালন-পালন এখন 'ডে-কেয়ার' বা 'ডিজিটাল ডিভাইস'-এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। এতে সামাজিক ও মানসিক বিকাশে সমস্যা দেখা দেয়। ২০২৩ সালে আমেরিকান অ্যাকাডেমি অব পেডিয়াট্রিকস জানায়, "Screen exposure and lack of parental bonding"-এর কারণে ADHD ও অটিজমের লক্ষণ বেড়ে গেছে প্রায় ২০%।

বৃদ্ধদের প্রতি অবহেলা

আগে পরিবারে বৃদ্ধরা সম্মানিত সদস্য ছিলেন। এখন তারা 'অপ্রয়োজনীয় বোঝা'। বৃদ্ধ নিবাসের সংখ্যা ইউরোপে গত দশ বছরে দ্বিগুণ হয়েছে। ২০24 সালের ইউরোস্ট্যাট তথ্যে দেখা গেছে, প্রতি ১০ জন বৃদ্ধের মধ্যে ৬ জনই সন্তানদের সঙ্গে থাকেন না।

বিয়ের অনাগ্রহ ও বিবাহবিচ্ছেদের উর্ধ্বগতি

পুঁজিবাদী মূল্যবোধ মানুষকে সম্পর্কের চেয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও ভোগের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। এর ফলে বিয়ের হার কমছে, আর বিবাহবিচ্ছেদ বাড়ছে। উদাহরণস্বরূপ:

* জাপানে ২০২৩ সালে প্রতি ১,০০০ জনে বিয়ের হার ছিল মাত্র **৪.১** (১৯৮০ সালে ছিল ১০.১)।
* আমেরিকায় প্রতি ২টি বিয়ের মধ্যে ১টি বিবাহবিচ্ছেদে গড়ায়।
* বাংলাদেশেও বিবাহবিচ্ছেদ বেড়েছে আশঙ্কাজনক হারে—২০০৫ সালে যেখানে ঢাকা শহরে প্রতি মাসে গড়ে ৩৫০টি ডিভোর্স হত, ২০২৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় **১,২০০**-তে।

ভোগবাদ ও 'Self-first' সংস্কৃতি

পুঁজিবাদ 'আমি আগে' মানসিকতা গড়ে তোলে। পরিবারের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য নয়, বরং নিজের চাওয়া-পাওয়াই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদির মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম পরিবার নয়, ব্যক্তিগত লাইফস্টাইলকে প্রাধান্য দিচ্ছে।

উপসংহার
পরিবার হলো সমাজের মূল একক। পুঁজিবাদ ধীরে ধীরে সেই কাঠামোকেই ভেঙে দিচ্ছে—মুনাফার জন্য নারীকে ঘর থেকে বাইরে, শিশুকে মায়ের কোল থেকে পর্দায়, আর বৃদ্ধকে সন্তানের ঘর থেকে বৃদ্ধাশ্রমে ঠেলে দিচ্ছে। আমাদের ভাবতে হবে—এটা কি 'উন্নয়ন' নাকি মূল্যবোধের বিপর্যয়?]

পুঁজিবাদ নারীর নারীত্ব কেড়ে নিয়েছে, নারীকে এনেছে ঘরের বাহিরে। নারীবাদ- পুঁজিবাদের ই বাই প্রোডাক্ট যা আজ মুসলিম পরিবার গুলোকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে, নারীকে বানিয়েছে পুরুষের সমকক্ষ, মাতৃত্বকে দেখানো হচ্ছে বোঝা হিসেবে এবং ঘরে থেকে স্বামী-সন্তানের দেখাশোনা করাখে পশ্চাদপদতা ও দাসত্বের প্রতীক হিসেবে।

পুঁজিবাদ কেন পরিবার ধ্বংস করছে? এতে পুঁজিপতিদের কী লাভ! চলুন দেখে নেয়া যাকঃ
কথিত প্রেম ভালোবাসা, ফ্রি সেক্স কালচার, সমকামিতা, অশ্লীলতার সাথে জড়িত রয়েছে বাঘা বাঘা করপোরেশন আর ইন্ডাস্ট্রির ভাগ্যবার্ষিক প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলারের সিনেমা, ওয়েবসিরিয, টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রি, ৫৩ বিলিয়ন ডলারের মিউযিক ইন্ডাস্ট্রি, ১৮৬ বিলিয়ন ডলারের সেক্স ইন্ডাস্ট্রি, ৯৭ বিলিয়ন ডলারের পর্ন ইন্ডাস্ট্রি, ৫০৭ বিলিয়ন ডলারের কসমেটিকস ও বিউটি ইন্ডাস্ট্রি, ৩ট্রিলিয়ন ডলারের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি, প্রায় ৪০০ বিলিয়ন

ডলারের ড্রাগ ইন্ডাস্ট্রি, প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলারের ডিপ্রেশনের চিকিৎসা সেক্টর, ৪৭ বিলিয়ন ডলারের যৌনবাহিত রোগের চিকিৎসা মার্কেট, টেস্টিং কিটের ৯৫ বিলিয়ন মার্কেট... অধিকাংশই কোনো না কোনো মাত্রায় টিকে আছে এই প্রেম ভালোবাসা আর ফ্রি সেক্স কালচারের উপর ভর করে। [২০৩।

প্রেম, অশ্লীলতা, যিনা-ব্যভিচারকে লাল কার্ড দেখালে এগুলোর কী হবে? বিশ্ব পরিচালনার নিয়মনীতি, বিশ্ব রাজনীতির হিসেব-নিকেশ, সবক্ষেত্রেই ব্যবসায়ীরা প্রভাবশালী খেলোয়াড়। তাই বিদ্যমান বিশ্বকাঠামো ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ব্যবস্থা, সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেলেও কথিত প্রেম ভালোবাসা, ফ্রি সেক্স কালচার, সমকামিতা, অশ্লীলতাকে প্রগতিশীলতা, উন্নতি, আধুনিকতা, স্মার্টনেস ইত্যাদির প্যাকেটে মুড়িয়ে প্রমোট করে যাচ্ছে এবং যাবে। এটা কখনোই বন্ধ হবে নাসোনার ডিম পাড়া রাজহাঁসকে এই বিশ্বব্যবস্থার কেউই খুন করবে না।

নারীবাদঃ বর্তমানে ইসলামী পরিবান ব্যবস্থা গঠনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর শীর্ষে আছে নারীবাদ।

মুসলিম পরিবারগুলো ধ্বংসের জন্য পশ্চিমাদের প্রধান হাতিয়ার নারীবাদ। যেসব প্রশ্ন দ্বারা ইসলামকে নিয়মিত আক্রমণ করা হয় তার সিংহভাগ ই নারীবাদ থেকে উৎসারিত। ৬০ এর দশকে উদ্ভাবিত এই মতবাদ আজ বিশ্বজুড়ে পরিবারব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য, নারীর স্বাভাবিক নারীত্ব কেড়ে নিয়ে তাকে পুরুষের সমকক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর জন্য ব্যপকভাবে দায়ী। মুসলিম নারীরাও আজ এই ইমান বিধ্বংসী মতবাদের কবলে। মুসলিম নারীরা আজ আল্লাহ প্রদত্ত বিধান নিয়ে সন্দেহ পোষণ করছে, উত্তরাধিকার আইন, তালাকসংক্রান্ত বিধিবিধান নিয়ে প্রশ্ন তুলছে! পর্দাকে ভাবছে উন্নতির পথের অন্তরায়! কেউ কেউ ইমান থেকে ই বের হয়ে যাচ্ছে! নাউজুবিল্লাহ।

পশ্চিমা সভ্যতা নারী অধিকার চায় না। তারা চায় ব্যবসা। নারীবাদ নারীকে অধিকার দেয় না (যদিও নারীরা মনে করে নারীবাদ তাদের অধিকার দেয়)। নারীবাদী অধ্যাপক ন্যান্সি ফ্রেজার তাঁর ‘Is Feminism the handmaiden of Capitalism’ আর্টিকেলে দেখিয়েছেন। বরং নারীবাদ নারীকে ১ম বিশ্বের ব্যবসায় পরিণত করে। নারীকে ভোগবাদী করা হয়, স্বাধীনতার নামে ব্যক্তিস্বাধীনতাবাদী সমাজবিচ্ছিন্ন স্বার্থপর করে ফেলা হয়। এবং নারীকে দিয়ে কৃত্রিম চাকরি সংকট তৈরি করে শ্রমকে কমদামী করে রাখা হয়। নারীর উপর দ্বৈত ভূমিকা চাপিয়ে

তাকে শারীরিক-মানসিকভাবে অসুস্থ করে ফেলা হয়। অধিকারের লোভ দেখিয়ে আরোপ করা হয় এক্সট্রা কর্তব্য।

চলুন নারী অধিকার, নারীর ক্ষমতায়নের নামে নারীবাদ বিশ্বকে কি দিয়েছে তা এক নজরে দেখে আসা যাক-

নারীবাদের আদর্শ নারীকে পরিবার আর বিয়ে থেকে 'মুক্ত' করেছে।

তাকে শিখিয়েছে, তোমার পরিবারের দরকার নেই, তোমার জীবনের সাফল্য হলো পুরুষের মতো যা ইচ্ছে তা করতে পারায়। তোমার সাফল্য নিহিত তোমার ক্যারিয়ারে, তোমার ডিগ্রিতে, তোমার আত্মপরিচয়ে। তুমি স্বাধীন, শক্তিশালী নারী, যা ইচ্ছে তাই করতে পারো।

স্বপ্নালু চোখের তরুণীরা নারীবাদের প্রেসক্রিপশান মেনে চলেছে অক্ষরে অক্ষরে।

শতভাগ কাজে লাগিয়েছে নতুন পাওয়া 'স্বাধীনতা'কে। যৌবনে চুটিয়ে প্রেম করেছে। নিজের সৌন্দর্য আর আর শরীর প্রদর্শন করেছে।
তারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে নিজেদের পড়াশুনা, চাকরি, ক্যারিয়ারকে

কিছুদিন ব্যাপারটা ভালোই চলছে। কিন্তু একপর্যায়ে তারা আবিষ্কার করছে এই স্বাধীনতা, এই অবাধ যৌনতা সাময়িক আনন্দ দিলেও, বুকের ভেতরের শূন্যতা দূর করতে পারছে না। আরো কিছুদিন যাবার পর দেখছে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদের কদর কমে আসছে। চোখগুলো আর আগের মতো তাদের দিকে ফিরছে না। পুরুষগুলো আর আকৃষ্ট হচ্ছে না আগের মতো।

একজন পুরুষ পরিবার শুরু করতে পারে মোটামুটি যেকোনো বয়সে। ৬০ বছর বয়সের পুরুষও নতুন বিয়ে করে বাবা হতে পারে। কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। শারীরিকভাবে নারীর উর্বরতা, অর্থাৎ মা হবার সক্ষমতা সবচেয়ে বেশি থাকে কৈশোরের শেষ দিক থেকে শুরু করে মোটামুটি ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত। তারপর খুব দ্রুত এই সক্ষমতা কমতে থাকে। আগে কখনো মা হয়নি, এমন কারো পক্ষে ৩৫ বছরের পর নতুন করে মা হওয়া কঠিন। ৪৫ বছরের পর মোটামুটি অসম্ভব। সহজ ভাষায়, ৩৫ এর আগে পরিবার শুরু না করলে, এর পর পরিবার শুরু করে সফল হওয়া, মা হওয়া একজন নারীর জন্য কঠিন।

কিন্তু নারীবাদের মন্ত্রে মুগ্ধ হওয়া নারীরা এ সময়টা কাটিয়ে দিচ্ছে স্বাধীনতার সুখে মজে, ক্যারিয়ার নিয়ে। সুখের তীব্রতা একটু ভোঁতা হয়ে আসার পর হঠাৎ আবিষ্কার করছে, তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ এমন একটা সময় পার হয়ে গেছে, যা আর ফিরে পাওয়া সম্ভব না। যৌবনে অনেক পুরুষের মনে ঝড় তোলা, অনেকের নির্ঘুম রাতের কারণ হওয়া, অনেক বান্ধবীর ঈর্ষার পাত্র হওয়া নারী চল্লিশের কোঠায় এসে নিজেকে একা, শূন্য আবিষ্কার করছে। মদের বারগুলোতে, মনোবিদের চেম্বারের ওয়েটিং রুমে, পর্নসাইটে মধ্যবয়স্ক একাকী নারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে, স্বামীর ভালোবাসার স্পর্শ শরীরে মেখে নিশ্চিন্তে ঘুমানোর সৌভাগ্য ওদের হয় না, ওদের ঘুমাতে হয় পোষা কুকুর আর বিড়ালকে জড়িয়ে।

নারীবাদ পরিবারকে ধ্বংস করে দিয়েছে। যৌনবিপ্লবের আদর্শ ও অবাধ প্রেম কীভাবে এই সভ্যতাগত বিপর্যয়ের পেছনে ভূমিকা রাখছে, এক নজর দেখে নেওয়া যাক। যে কারণে জন্মহার কমে যাচ্ছে:

১। ডিভোর্সের উচ্চ হার: অ্যামেরিকাতে প্রায় ৫০ শতাংশের মতো বিয়েতে তালাক হয়ে যায়। অন্যদিকে বিয়ে স্থায়ী হওয়া নিয়ে যদি আশঙ্কা থাকে, তাহলে স্বভাবতই সন্তান জন্মদানের ইচ্ছা কমে আসে

২। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিয়ে করার হার এখন অনেক কমে গেছে। জাপানে তো বিবাহে অনিচ্ছুকদের জন্য একটা নামই বরাদ্দ করা হয়েছে- 'শো'যাদের বয়স ৩০ এর কোঠায়, কিন্তু বিয়ে করার ধারেকাছেও নেই তাদের বলা হয় শো। জাপানে এমনিতেই বৃদ্ধ লোকের সংখ্যা বেশি। বিয়েতে এমন অনীহা জন্মহার কমে যাওয়া সমস্যার আগুনে একেবারে ঘি ঢালার মতো। কেবিনেট অফিসের জেন্ডার রিপোর্ট ২০২২ বলছে- ৩০+ বয়সীদের প্রতি ৪ জনে ১ জন বিয়ে করতে চায় না। ২০+ বয়সীদের অবস্থাও প্রায় একই রকম

কেন বিয়েতে আগ্রহী না এই প্রশ্নের উত্তরে জরিপে অংশ নেওয়া মেয়েদের উত্তরগুলো পরিচিত। তথাকথিত প্রগতিশীলতা আর স্বাধীনতার সেই মুখস্থ বুলি-বিয়ে করলে আমরা স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলবো, আমাদের সামনে সুন্দর ক্যারিয়ার আছে, গতানুগতিক গৃহিণীরা যে

ঝামেলাগুলো নেয় যেমন, বাড়ির দেখভাল করা, বাচ্চাকাচ্চা মানুষ করা, ঘরের বয়স্কদের দেখাশোনা করা... আমরা সেগুলো করতে চাই না।

পুরুষরাও নিজেদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কথা বললো। সেই সাথে বললো চাকরির নিরাপত্তাহীনতা এবং পরিবার চালানোর জন্য যথেষ্ট আয় রোজগার না থাকার কথা।[১৩]

৩। যিনা। যিনাকে সারা বিশ্বজুড়ে স্বাভাবিক করে ফেলা হয়েছে। যৌনতাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে বিয়ে থেকে। পরিবার গড়াকে অনেকেই উটকো ঝামেলা মনে করে।

৪। যারা বিয়ে করছে তারাও করছে বেশি বয়সে। ত্রিশের ঘরে বয়স না গেলে বিয়ে হচ্ছে না। দাম্পত্য জীবনের সময়সীমা কমে আসছে। বয়স পঁয়ত্রিশ হবার পর প্রথমবারের মতো মা হওয়া খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। সব মিলিয়ে বাচ্চা কম হচ্ছে।

৫। পঙ্গপালের মতো নারীরা ঘর থেকে বের হয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছে। প্রেগন্যান্সি, ডেলিভারি, বাচ্চা জন্ম দেওয়ার ঠিক পরের সময়টাতে নারীদের কাজ থেকে ছুটি নিতে হয়। এটা তাদের ক্যারিয়ারের জন্য ভালো না। কাজেই ক্যারিয়ারের স্বার্থে নারীরা সন্তান নিতে চাচ্ছে না। একটা বা খুব বেশি হলে কষ্টেমষ্টে দু'টাবাচ্চা পালনের সময় বের করাই মুশকিল, তিন-চারটা বাচ্চা মানুষ করার কথা তো কল্পনাও করা যায় না।

৬। মহামারির মতো বাড়ছে বিভিন্ন যৌন-মানসিক বিকৃতি: সমকামিতা, নারী থেকে পুরুষ, পুরুষ থেকে নারীতে রূপান্তরিত হওয়া সহ আর কতো কী!

আর এর সবকিছুই নারীবাদের ফল। অবাধ ভালোবাসা আর যৌনতার সংস্কৃতি। জন্মহার কমে যাওয়া একটা সভ্যতাগত সমস্যা। মানুষ ছাড়া সভ্যতা কীভাবে টিকে থাকবে? তরুণরা না থাকলে সমাজকে কে এগিয়ে নেবে? কে কাজ করবে? কে সভ্যতা গড়বে? কারা নিত্য নতুন উদ্ভাবন করবে? বৃদ্ধদের দেখাশোনা কারা করবে?]

মুসলিমবিশ্বে নারীবাদের ভয়াবহতা বুঝার জন্য মরোক্কোতে বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে হওয়া নিচের রিপোর্টটিতে চোখ বুলিয়ে নিতে পারি:

বিচ্ছেদ ও নারীবাদ: মরক্কোয় এক প্রজন্মের অবক্ষয়

নারীবাদ—এক ধীর ও বিষাক্ত প্রক্রিয়া, যা সমাজকে ধ্বংস করে বহু প্রজন্মজুড়ে। পশ্চিমা সমাজে এর প্রতিক্রিয়া আমরা বহু আগেই প্রত্যক্ষ করেছি, এবং এখন মুসলিম বিশ্বেও এর প্রভাব স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান, অত্যন্ত অস্থির ও সহিংস রূপে।

২০২১ সালে মরক্কোর সরকার প্রকাশিত বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কিত পরিসংখ্যান এক গভীর সামাজিক সংকটের ইঙ্গিত দেয়। সে বছর নতুন দশটি বিবাহের বিপরীতে সাতটি দম্পতির বিচ্ছেদ ঘটে—অর্থাৎ বিচ্ছেদের হার প্রায় ৭০ শতাংশ। এটি শুধু মুসলিম বিশ্বের জন্যই নজিরবিহীন নয়, বরং পশ্চিমা দেশগুলোকেও ছাড়িয়ে গেছে।

বিবাহে বিমুখতা: তরুণ প্রজন্মের সংকট

মরক্কোর জাতীয় মানব উন্নয়ন পর্যালোচনা সংস্থা ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (UNDP) এক যৌথ প্রতিবেদনে উঠে আসে তরুণদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপর কোভিড-১৯ পরবর্তী প্রভাব। রিপোর্ট অনুযায়ী, মরক্কোর তরুণেরা পরিবার গঠনের চিন্তায় আগ্রহী হলেও বাস্তবে তারা ক্রমাগত বিবাহে অনাগ্রহী হয়ে উঠছে। ২০১১ সালে যেখানে ৪২% তরুণ বিবাহে অনাগ্রহী ছিলেন, ২০১৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭০ শতাংশে।

নারীবাদের প্রভাব ও পারিবারিক মূল্যবোধের অবক্ষয়

ইতিহাসে মুসলিম সমাজে এমন উচ্চ বিবাহবিচ্ছেদের হার আগে কখনো দেখা যায়নি। তাহলে প্রশ্ন আসে, এই আকস্মিক ও ব্যাপক পরিবর্তনের উৎস কী?

বর্তমান বৈশ্বিক ব্যবস্থায় ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে পশ্চিমা উদারতাবাদ ও নারীবাদের ধারণা অনুপ্রবেশ করছে। এর ফলে ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে পারিবারিক মূল্যবোধ, বেড়েছে সম্পর্ক নিয়ে অনাস্থা ও ভয়, এবং দেরিতে বিবাহের প্রবণতা। মরক্কোর পারিবারিক মধ্যস্থতা কেন্দ্রের প্রধান অধ্যাপক হাসান রাকেক বলেন:

“আমাদের পারিবারিক সংহতির যে ঐতিহ্য ছিল, তা এখন প্রায় বিলুপ্তপ্রায়। তরুণেরা সামাজিক মাধ্যম ও টেলিভিশনের আইডিয়ালিস্টিক বিবাহ ধারণায় প্রভাবিত হচ্ছে, অথচ বিবাহ মানে কেবল প্রেম নয়—এটি সহাবস্থান, সহনশীলতা ও ত্যাগের নাম।”

তিনি আরও বলেন, অধিকাংশ তরুণ-তরুণীর মাঝে বিবাহ নিয়ে ভীতি তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে তাদের যাদের পরিবারে বা পরিচিতজনদের ব্যর্থ দাম্পত্যের অভিজ্ঞতা রয়েছে। একজন নারী যদি আগের বিবাহে মানসিক আঘাত পান, তবে পুনরায় বিয়ে করার ক্ষেত্রে তার দ্বিধা আরও বেড়ে যায়।

উপনিবেশিক উত্তরাধিকার, পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা ও সংস্কৃতির আধিপত্য

এই পারিবারিক মূল্যবোধের ধ্বংসের পেছনে রয়েছে ঔপনিবেশিক প্রভাব, পশ্চিমা অনুকরণে গড়া শিক্ষাব্যবস্থা এবং সংস্কৃতি বিস্তারে ‘লিবারাল সফট পাওয়ার’। ফলে মুসলিম সমাজ এক ধরনের চক্রব্যূহে আটকে যাচ্ছে—বিবাহবিচ্ছেদ বাড়ছে, পরিবার নামক প্রতিষ্ঠান দুর্বল হচ্ছে, আর এতে নতুন বিবাহের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। অচিরেই আমাদের সমাজও হয়তো ইউরোপীয় সমাজের মতো হয়ে উঠবে—যেখানে মানুষের আর পারিবারিক বন্ধনে আস্থা নেই, আত্মীয়তার বন্ধন বিলুপ্তপ্রায়।]

তথ্যসূত্র:

* Moroccan Government Divorce Statistics, 2021
* National Observatory for Human Development & UNDP Report, Morocco
* Commentary by Professor Hassan Raqeq, Moroccan Center for Mediation and Arbitration

অবস্থা বেগতিক দেখে খোদ পশ্চিমারা বলতে শুরু করেছে, শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল হলো পরিবার।

পশ্চিমারা নিজেরাই এখন নারীবাদের বাস্তবতা বুঝতে শুরু করেছে। পশ্চিমেও এখন নারীবাদ বিরোধী ধারণা পোক্ত হচ্ছে, নিচের রিপোর্ট টি তারই প্রমাণ দেয়:

আধুনিক নারীবাদ: মুক্তির নামে প্রতারণা*

একসময় নারীজাতিকে ঘিরে যে সম্মান ও মর্যাদার আবহ ছিল, আধুনিক নারীবাদ সেটিকে বিকৃত করে ফেলেছে। নারীত্বকে এক আত্মকেন্দ্রিক মতাদর্শে রূপ দিয়ে, এমন সব প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করে দিয়েছে—যেগুলো নারীদের জীবনে প্রকৃত শক্তি, স্থিতি আর উদ্দেশ্য এনে দিতে পারত। নারীবাদ নারীকে ক্ষমতায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রয়ে গেছে ফাঁকা বুলি হিসেবে। বাস্তবে নারীরা পেয়েছে নিঃসঙ্গতা, ভাঙা পরিবার আর দিকহারা আত্মা।

নারীবাদ কি সত্যিই নারীদের উপকার করেছে, না কি ঠকিয়েছে?

এই আন্দোলনের খেসারত দিতে হয়েছে শুধু নারীদের নয়, গোটা পরিবার, সমাজ, এমনকি পরবর্তী প্রজন্মকেও। সমতার দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলনটি এখন বিবাহ, মাতৃত্ব ও ঈশ্বরপ্রদত্ত নারীত্বের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহে রূপ নিয়েছে। পরিবারকে শক্তিশালী করতে নারীবাদ কখনো উৎসাহ দেয়নি। বরং বলেছে—নারীর জীবনে পুরুষের দরকার নেই, সরকারই হোক পিতার জায়গায়, আর সাফল্য মানেই পরিবার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা।

কিন্তু এটি শুধু সামাজিক নয়, এটি এক গভীর আধ্যাত্মিক সংকট। নারীবাদ নারীর পরিচয়কেই নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছে। এখন নারীত্ব মানেই ক্যারিয়ার আগে, সন্তানপালন পরে; নিজের স্বার্থ আগে, আত্মত্যাগ পরে; ক্ষমতা আগে, পারস্পরিক সহযোগিতা পরে।

নারীবাদের বিবর্তন: একটি আদর্শের পথভ্রষ্টতা

প্রথম তরঙ্গ নারীবাদ শুরু হয়েছিল উনিশ শতকে—নারীর ভোটাধিকার ও আইনগত স্বীকৃতির জন্য। সে সময় অনেক নারীবাদী পরিবার ও নৈতিকতার পক্ষে কথা বলেছিলেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই আদর্শ বদলে গেল।

দ্বিতীয় তরঙ্গ, ষাট-সত্তরের দশকে, নারীদের যৌন স্বাধীনতা, অবাধ তালাক আর প্রথাগত নারীত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

তৃতীয় তরঙ্গ, নব্বইয়ের দশকে, আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে লিঙ্গ পরিচয়ের ভাঙন, গর্ভপাতের পক্ষে জোরালো অবস্থান, ও পুরুষত্বকে হেয় করার রীতিকে গ্রহণ করে।

প্রতিটি ধাপে নারীবাদ ঈশ্বরনির্ধারিত নারীত্ব থেকে সরে এসেছে। পরিবার নয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে গুরুত্ব দিয়েছে। যে আন্দোলন একসময় ছিল অধিকারের জন্য, তা আজ ঈশ্বরের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহে পরিণত হয়েছে।

পুরুষ ও পিতৃত্বের বিরুদ্ধে নারীবাদের আঘাত

আধুনিক নারীবাদের ভয়াবহ দিকগুলোর একটি হলো—পুরুষ ও পিতৃত্বকে টার্গেট করা। "নারীমুক্তি"র নামে পুরুষদেরকে দোষী বানিয়ে, তাদের প্রাকৃতিক সুরক্ষাদান ও রক্ষণাবেক্ষণকারী ভূমিকাকে অস্বীকার করা হয়েছে। ফলাফল?

* নারী সরকারকে স্বামীর জায়গায় বসিয়েছে, ভাতাকে করেছে পিতার বিকল্প, আর সন্তানের জন্ম বহির্ভূতভাবে হওয়াকে "উন্নয়ন" হিসেবে দেখানো হয়েছে।
* তালাক সহজ করে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে পরিবার ভেঙে সন্তানরা বড় হচ্ছে বাবার ছায়া ছাড়াই।
* সংস্কৃতি এখন এমন বার্তা দিচ্ছে—সত্যিকারের সুখ মানে স্বাধীনতা আর যৌন স্বাধীনতা, নয় বিবাহ বা পরিবার।

এই ক্ষতির পরিসংখ্যান ভয়াবহ:

* আমেরিকায় ১৮.৫ মিলিয়নেরও বেশি শিশু বেড়ে উঠছে নিজের জন্মদাতা বাবার ছায়া ছাড়াই।
* বিবাহের হার কমছে, অনেক নারী পরে বুঝতে পারছে—ক্যারিয়ারের পেছনে ছুটতে গিয়ে তারা সংসার হারিয়েছে।
* নারীদের মধ্যে বিষণ্ণতা, একাকীত্ব, উদ্বেগ বেড়েই চলেছে—যদিও তাদের বলা হয়েছিল, নারীবাদ তাদের পূর্ণতা এনে দেবে।

নারীবাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও যন্ত্রণার ফল

নারীবাদ বহুদিন ধরেই এমন সব প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে, যা সে নিজেই রাখতে পারেনি। তারা নারীদের বলেছে—বিবাহ ও মাতৃত্ব মানে শৃঙ্খল, সত্যিকারের স্বাধীনতা মানে পরিবারকে ত্যাগ করে নিজের পথে হাঁটা, আর জীবনের পূর্ণতা পাওয়া যাবে ঘরের বাইরের জগতে।

কিন্তু আজ আমরা কী দেখছি?

১. বহু প্রজন্মের নারী—যারা ক্যারিয়ারকে বেছে নিয়ে পরিবার ত্যাগ করেছে—আজ একাকী, হতাশ ও পস্তাচ্ছে।

২. সমাজ পুরুষদের তাদের সৃষ্টিগত নেতৃত্বের স্থান থেকে সরিয়ে দিয়েছে। এখন তাদের চিত্রিত করা হয় নিপীড়ক হিসেবে, যার ফলে নারী-পুরুষের বিভেদ আরও বাড়ছে।

৩. গর্ভপাতকে নারীর "অধিকার" বলা হলেও, তা নারীর হৃদয়ে ও আত্মায় গভীর ক্ষত সৃষ্টি করছে। নারীকে বলা হয়েছে, তার শক্তি জীবনের ধারক হিসেবে নয়, বরং জীবনকে ধ্বংস করার ক্ষমতায় নিহিত।

৪. এমনকি গির্জাও এই সংস্কৃতির সাথে আপস করেছে। কিছু উপাসনালয় গর্ভপাতের পক্ষ নিয়েছে "সহানুভূতির" নামে।

চূড়ান্তভাবে, গির্জাগুলোও আজ নারীবাদের পথে হাঁটছে।

চার্চ আজ গর্ভপাত, LGBTQ+, ও লিঙ্গ নিরপেক্ষতা নিয়ে সমাজের মতাদর্শ মেনে নিচ্ছে, যা সরাসরি বাইবেলবিরোধী।

শেষ কথা: নারীবাদের ফল কী?

এই আন্দোলনের ফল স্পষ্ট—একাকীত্ব, সম্পর্কহীনতা, ভাঙা পরিবার, ও ঈশ্বরের পরিকল্পনা থেকে দূরে সরে যাওয়া।

নারীবাদ নারীদের মুক্ত করেনি—বরং ঠেলে দিয়েছে এক দুঃখজনক চক্রে: অসন্তোষ, বিদ্রোহ ও অনুশোচনার।

এখন সময় এসেছে চোখ খুলে সত্যটা দেখার। নারীবাদ নারীদের যা দিতে চেয়েছিল, তার বিপরীতটাই দিয়েছে। আর তাতে শুধু নারী নয়—সমস্ত সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

২. ফ্রি-মিক্সিং/অশ্লীলতার প্রসার:

অবাধ প্রেম ও যৌনতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিয়ে এবং পরিবারকে দুর্বল করে। এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হল যৌনবিপ্লবের জন্মস্থান অ্যামেরিকার বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থা। ক্ষয় হতে হতে অ্যামেরিকার অধিকাংশ পরিবার আজ ফাঁপা খোলসে পরিণত হয়েছে। অ্যামেরিকায় জন্ম হওয়া মোট শিশুর প্রায় ৪১%-ই হলো বিয়ে বহির্ভূত প্রেমের ফসল। অর্থাৎ, আজ অর্ধেকের কাছাকাছি অ্যামেরিকান শিশু আক্ষরিক অর্থেই জারজ। যেসব ক্ষেত্রে বিয়ের পর বাচ্চা হচ্ছে, সেই বিয়েগুলোরও বড় একটা অংশ টিকছে না। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে প্রতি ৪ জনে ১ জনের ঘরে বাবা নেই। আফ্রিকান অ্যামেরিকানদের ক্ষেত্রে এ সংখ্যা আরো অনেক বেশি, ১০০ জন শিশুর মধ্যে ৬৫ জনের ঘরেই বাবা নেই।

এই শিশুরা বড় হচ্ছে ভাঙা পরিবারে, বাবার ছায়া ছাড়া। সন্তানদের সঠিক মানসিক এবং আত্মিক গঠনের জন্য বাবা এবং মা, দুজনের উপস্থিতিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাবাকে ছাড়া বেড়ে ওঠা প্রজন্মের মধ্যে দেখা যাচ্ছে নানা ধরনের অস্থিরতা আর অসুখ। বিচ্ছিন্ন পরিবারের সন্তানদের অপরাধে জড়িত হবার প্রবণতা বেশি থাকে। এরা পড়াশোনায় খারাপ করে, স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। দরিদ্রতা, বৈষ্যমের মধ্যে বড় হয়। গবেষণার পর গবেষণা জানালো অল্প বয়স্ক খুনি, সিরিয়াল কিলার, 'ভালো লাগছে না, যাই ক্লাসরুমে, শপিং মলে কিংবা জনসমাবেশে গুলি করে পাখির মতো মানুষ মেরে আসি'-মানসিকতার ম্যাস কিলার, মাদকসেবী, মাদক ব্যবসায়ী, ধর্ষক, মাস্তান, গ্যাং মেম্বার ১৭৬), বাসায় বউ পেটানো, বাচ্চাদের মারধর করা, বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় ভোগা মানুষদের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য কমন- তাদের ঘরে বাবা নেই, তাদের বাবা মায়ের বিচ্ছেদ হয়েছে। শুধু তাই না, লিভ টুগেদার করা যুগলদের বাচ্চাদের ৪২% এর মধ্যে বন্ধুদের ধরে মারপিট করার প্রবণতা দেখা যায়, যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। এদের কারাগারে যাবার সম্ভাবনাও স্বাভাবিক পরিবারের বাচ্চাদের তুলনায় ১২ গুণ বেশি! [১৭৭]

সস্তা প্রেম আর যৌনতাকেন্দ্রিক চিন্তাধারা সমাজেও অস্থিরতা তৈরি করেজন্ম দেয় নানা সামাজিক অসুখের। পারিবারিক বন্ধনের মতো পশ্চিমে সমাজ ব্যবস্থাও ভেঙে পড়েছে। ওদের তরুণ-তরুণীরা ক্ষুব্ধ, একা। ওরা বিভ্রান্তিতে ভুগছে আত্মপরিচয়, নিজের দেহ, পৃথিবীতে নিজের অবস্থান ও ভূমিকা-সবকিছু নিয়েই। নারীর দেহে আটকা পড়া পুরুষ, পুরুষের দেহে আটকা পড়া নারী, সাদার দেহে আটকা পড়া কালো, মানুষের দেহে আটকা পড়া পশু-এমন হাস্যকর সব বিভ্রান্তিতে দিন পার করছে ওরা। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দারিদ্র্য, অস্থিরতা, সহিংসতা। যৌনরোগ, গর্ভপাত, বিচ্ছেদ, মাদকাসক্তি, পর্ন আসক্তি, খুনোখুনি, সহিংসতা আগের সব মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। ছোটবেলায় কোলেপিঠে করে মানুষ করা বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। করোনার সময় অ্যামেরিকাতে সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা গেছে বৃদ্ধাশ্রমে।

অথবা বৃদ্ধ বাবা-মা কোনোমতে একা ফ্ল্যাটে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন। ঘরের কোণে পড়ে থাকছে তাদের বিস্মৃত জীবনের বিস্মৃত লাশকেউ জানছে না, খোঁজও নিচ্ছে না পচেগলে গন্ধ বের হবার পর প্রতিবেশীদের টেলিফোনে পুলিশ গিয়ে উদ্ধার করছে। এভাবেই পশ্চিমা সমাজ তার প্রবীণ সদস্যদের সাথে আচরণ করে। এই বুঝি আধুনিকতা?

পতনোন্মুখ সভ্যতায় যেসব বৈশিষ্ট্য থাকে, দেখা যাচ্ছে তার সবক'টিই। স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ মাত্রায় হতাশা আর বিষণ্ণতায় ভুগছে তারামেয়েদের মধ্যে এ সংখ্যা অনেক বেশি। হতাশার অনিবার্য পরিণতি সুইসাইডকেও আপন করে নিচ্ছে তারা। আত্মহত্যার হার তরুণ-তরুণীদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশিপ্রতি ৫ জনে ১ জন আত্মহত্যা করার কথা ভাবছে। ২০০৭ সালের তুলনায় সুইসাইড বেড়ে গিয়েছে প্রায় ৬০%। অ্যামেরিকার টিনেজারদের মৃত্যুর দুই নম্বর কারণই হচ্ছে সুইসাইড

স্বপ্নের দেশ কানাডার অবস্থাও একই রকম। প্রতি ৩ জন কানাডিয়ানের মানসিক স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্মুখীন।

একটা সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেবার জন্য এমন বাবা-মা ছাড়া, বিবাহ বহির্ভূতভাবে জন্ম নেওয়া, স্থায়ী পরিবার ছাড়া বেড়ে ওঠা একটা জেনারেশনই যথেষ্টবেগতিক অবস্থা দেখে বিবাহ বহির্ভূত যৌনতাকে পূজা করা পশ্চিমারাই এখন বলতে শুরু করেছে শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য সবচেয়ে আদর্শ ব্যবস্থা হলো বিয়ের পবিত্র বন্ধনে গড়ে ওঠা পরিবার।"

একটি সুস্থ সুন্দর পরিবার গঠনের পথে প্রধান অন্তরায় অশ্লীলতার প্রসার। বর্তমান সমাজে অশ্লীলতা ঠিক কোন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে তার বাস্তবতা বুঝার জন্য নিচের জরিপটি দেখা যেতে পারে।

"এক বিভাগীয় শহরে ১৬-১৯ বছর বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জরিপ চালান শিশু সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ শাবনাজ জাহরিন। জরিপের পর তিনি দেখতে পান তাদের মধ্যে (ছেলেমেয়ে উভয়ই) শতকরা প্রায় ৬০ জন যৌন মিলন করেছে। বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষী হবার কারণে সাংবাদিকদের অবাক হবার ক্ষমতা সাধারণত নষ্ট হয়ে যায়। তবে শাবনাজ জাহরিনের এই বক্তব্য শুনে এটিএন বাংলার সাংবাদিকও নিজের বিস্ময় গোপন রাখতে পারলেন না।

ঠিক একই রকম ভয়ঙ্কর তথ্য দিয়েছেন ড. সাইয়েদ জাহাঙ্গীর হায়দার ও তার গবেষক দল। তারা গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন যে, ১৯+ বছর বয়সী অবিবাহিত ছেলেদের প্রতি ১০ জনে ৬ জনই যৌন মিলন করে ফেলেছে। একই বয়সী প্রতি ১০০ জন নারীর মধ্যে ২৪ জনই বিছানায় শুয়ে পড়েছে। শহরাঞ্চলের নারীদের মধ্যে এই হার প্রতি ১০ জনে প্রায় ৫ জন! [৪]

গর্ভপাত, ডাস্টবিনে কুকুরের মুখে নবজাতক লাশের সংখ্যা বাড়ছে হু হু করে শুধু ২০১৪ সালেই বাংলাদেশে প্রায় ১২ লাখ অনিরাপদ গর্ভপাত করানো হয় আর এর বেশিরভাগই অবিবাহিতদের। আমাদের দেশে বিবাহিতদের চেয়ে অবিবাহিত কিশোরীদের গর্ভপাত করানোর হার পঁয়ত্রিশ ভাগ বেশি!!]

বিবাহ বহির্ভূত প্রেম-অশ্লীলতা পারিবারিক জীবনে যেভাবে প্রভাব ফেলে তার একটি ছোট্ট উদাহরণ হতে পারে এই পরিসংখ্যান টি:

অ্যামেরিকায় বেশিরভাগ বিয়েই হয় প্রেমের কারণে এবং সেখানকার ডিভোর্সের শতকরা হার ৪০-৫০ এর মধ্যে ঘোরাফেরা করে। ৪০-৫০ শতাংশ বিচ্ছেদের মধ্যে অ্যারেঞ্জড ম্যারেজে বিচ্ছেদের হার মাত্র ৪ শতাংশ। [১৪৬]

অধ্যাপক, বিখ্যাত সংস্থা সাইকোলজি টুডে-র সাবেক প্রধান সম্পাদক, অ্যামেরিকার সায়েন্টিফিক ম্যাগাজিন MIND এর সম্পাদক ড. রবার্ট এপস্টিনের

মতে অ্যামেরিকার এই উচ্চ বিচ্ছেদের হারের কারণ হলো ল্যাভ ম্যারেজ। এই বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে এমন মতও এসেছে যে-যে দেশ বিয়ের ক্ষেত্রে অ্যামেরিকার মডেল অনুসরণ করবে, সেই দেশে বিয়ে ততো ব্যর্থ হবে। [১৪৭]

ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী সৌল-জুর-ডন এর মাঠ পর্যায়ের একটি গবেষণার ফলাফল হচ্ছে: “যে বিয়ের পাত্র-পাত্রী বিয়ের আগে প্রেমে পড়েনি, এমন বিয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি সফল।"

অপর এক সমাজবিজ্ঞানী 'আব্দুল বারী' কর্তৃক ১৫০০ টি পরিবারের উপর পরিচালিত গবেষণার ফলাফল হচ্ছে: ৭৫% এর বেশি প্রেমঘটিত বিয়ের তালাকের মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অথচ অ্যারেঞ্জড ম্যারেজের ক্ষেত্রে, তালাকের হার ৫% এরও নিচে! [১৪৮] মুম্বাই হাইকোর্ট তাদের পর্যবেক্ষণ থেকে দাবি করেছে-ভারতে অ্যারেঞ্জড ম্যারেজের তুলনায় লাভ ম্যারেজে ডিভোর্সের হার অনেক বেশি। [১৯]

রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের দু’জন মনোবিজ্ঞানী উষা গুপ্তা এবং পুষ্পা সিং পাশ্চাত্যের মতো প্রেমের বিয়ে আর উপমহাদেশের গতানুগতিক অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ নিয়ে বেশ চমৎকার একটা গবেষণা করে ১৯৮২ সালে। সেই গবেষণায় দেখা যায়-অ্যারেঞ্জড ম্যারেজের ক্ষেত্রে দিন দিন ভালোবাসা শক্তিশালী হতে থাকে। ড. রবার্ট এপস্টিনের কথা আমরা আগেই বলেছি। তার মতে, প্রেমের বিয়ের ক্ষেত্রে ভালোবাসা মোটামুটি দুই বছর পর কমতে শুরু করে। কিন্তু অ্যারেঞ্জড ম্যারেজের ক্ষেত্রে এটা দিন দিন বাড়তে থাকে। [১৬২]

প্রকৃতপক্ষে লাভ ম্যারেজে ভালোবাসাটাই তৈরি হতে পারছে না ঠিকঠাক মতো। যা হচ্ছে তা খুবই স্বল্প পরিমাণ, ক্ষণিকের ভালোবাসা। বাকিটা জুড়ে আছে মোহ আর কামনা।

কিন্তু অ্যারেঞ্জড ম্যারেজে কি আসলেই ভালোবাসা তৈরি হয়? দু’জন স্বল্প পরিচিত মানুষ এক ছাদের নিচে আসলেই ভালোবাসা তৈরি হয়? ভালোবাসা কি তৈরি হবার জিনিস? এটা তো একটা অনুভূতি... প্রশ্ন আসতে পারে।

ড. রবার্ট এপস্টিনের মত হলো-ভালোবাসা তৈরি করা যায়প্রথমে হয় বিয়ে আর তারপর ভালোবাসা তৈরি হয়। [১৬৩]

ভালোবাসার উপাদানগুলো আর অনুভূতিগুলো দেখো-সামাজিক স্বীকৃতি, দায়িত্ববোধ, নিরাপত্তা, শান্তি, শ্রদ্ধা, মায়া, মমতা, বন্ধন, দায়বদ্ধতা, পারস্পরিক বিশ্বাস, সন্তান বড় করে তুলবার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ। এসব কি অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ ছাড়া হয়?

৩. নারীদের উচ্চশিক্ষা/ক্যারিয়ারমুখী হওয়া:

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য বলছে, গত সাত বছরে তালাকের প্রবণতা ৩৪ শতাংশ বেড়েছে। শিক্ষিত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তালাক বেশি হচ্ছে।প্রথম আলো'রা মতে, ঢাকা শহরে গড়ে প্রতি ঘণ্টায় একটি করে তালাকের আবেদন করা হচ্ছে।

দুই সিটি করপোরেশনের তথ্য বলছে, স্ত্রীর পক্ষ থেকে তালাকের আবেদন বাড়ছে।

ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণে তালাকের আবেদনের প্রায় ৭০ শতাংশই স্ত্রীর পক্ষ থেকে এসেছে।

কেন মেয়েরা এত তালাকে আগ্রহী? জবাবে সমাজ-বিজ্ঞানী প্রফেসর মেহতাব খানম 'দৈনিক ইনকিলাব'-কে বলেন, 'দুটি কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ বাড়ছে।

মেয়েরা আগের চেয়ে বেশি শিক্ষিত হচ্ছে। তারা এখন অনেক সচেতন। মুখ বুজে নির্যাতন সহ্য না করে ডিভোর্সের পথ বেছে নিচ্ছে।

মেয়েরা আগের চেয়ে বেশি শিক্ষিত এবং স্বাবলম্বী হওয়ায় আত্মঅহংকার বেড়েছে। সামাজিক ও পারিবারিক বাঁধন মানতে নারাজ তারা।

বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক অ্যাডভোকেট এলিনা খান বলেন, 'নারীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সহনশীল মনোভাব থাকা। তারা সহনশীল থাকলে তালাকের পরিমাণ এত বাড়ত না।এজন্য এই না যে নারীর প্রতি নির্যাতন হচ্ছে না নির্যাতন হলেই সরাসরি তালাক দিতে হবে তা না; কিছুদিন দেখে-বুঝে তারপর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত, তাহলেই এই সংখ্যা কমানো সম্ভব। ক্ষমতায়নের কারণে নারী তালাকে পুরুষের চেয়ে এগিয়ে গেছে। পারিবারিক মূল্যবোধ ও সহনশীলতা ধরে রাখলেই এই সংখ্যা কমানো সম্ভব।

অর্থাৎ নারী আর নিজেকে দুর্বল ভাবছে না, বাধ্যতা-আনুগত্য শব্দগুলোকে মেয়েরা ঘৃণা করছে। সবল-দুর্বল মিথোজীবিতা-নির্ভরশীলতা-মমতা-সুরক্ষাদান
-এই ন্যাচারাল ফ্যাক্টরগুলো অকেজো হয়ে 'সমানে সমান' স্ট্রেস তৈরি হচ্ছে সম্পর্কের ভেতর। ফলে নারী-পুরুষ ন্যাচারাল সাইকোলজি-বিরুদ্ধ এই চেতনা পরিবারের ন্যাচারাল গাঁথুনি নষ্ট করছে। পরিবার পরিণত হয়েছে স্রেফ ৫০-৫০ শেয়ারের পার্টনারশিপেপাঠ্যক্রমে নারীবাদ শেখানো হচ্ছে, নারীবাদের বিষাক্ত সব দর্শন শিশুবয়স থেকেই ঢুকানো হচ্ছে বাচ্চাদের মগজে। নারীশিক্ষা, নারীমুক্তি, নারী-অধিকার, নারীপ্রগতি, নারীর ক্ষমতায়ন- ইত্যাদি মুখরোচক শব্দের আড়ালে কদর্য নারীবাদী দর্শন চোখ বুঁজে গিলে নিচ্ছে আমাদের মেয়েরা যার প্রভাব গিয়ে পড়ছে দাম্পত্য সম্পর্কের উপর, ভুক্তভোগী হচ্ছে ভবিষ্যত প্রজন্ম।

নারীর উচ্চশিক্ষা, ক্যারিয়ারমুখী হওয়া কীভাবে পরিবারের জন্য ক্ষতিকর, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ধ্বংসাত্মক তা নিচের তথ্যবহুল রিপোর্ট টি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়ঃ

একই পরিমাণ স্ট্রেস পুরুষের চেয়ে নারী শরীর ও মনের উপর বেশি প্রভাব ফেলে।

পুরুষের চেয়ে স্ট্রেসে থাকা একজন নারীর শারীরিক ক্ষতি বেশি হয়, মানসিক অসুখও বেশি হয়। [Stress and your health, Office on Women’s Health, U.S. Department of Health and Human Services]

স্ট্রেসের প্রভাবে লক্ষণগুলো নারীদের বেশি প্রকাশ পায়। কারণ, একই স্ট্রেসে নারীদের স্ট্রেস-হরমোন কর্টিসল বেশি বের হতে থাকে’(Verma, 2011)

• উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, টেনশন-জাতীয় মাথাব্যথা ও মানসিক রোগগুলো নারীদের বেশি হয়। (Hammen, 2009) এবং কমবয়েসী নারীদের হার্টের সমস্যাগুলো মূলত হার্টের ওপর এই স্ট্রেসের কারণেই হয়। (Vaccarino, 2014)

এবং আমরা আরও দেখেছি, পুরুষের তুলনায় একে তো তাদের স্ট্রেস সামলানোর শারীরিক প্রক্রিয়াগুলো দুর্বল। তার উপর আবার পুরুষের তুলনায় তারা অধিক স্ট্রেসে এক্সপোজড। নারীর এই অতিরিক্ত স্ট্রেসের উৎস কর্মস্থল :

• অফিসে ও বাসায় নারীর 'দ্বৈত ভূমিকাই' তাদের কর্মস্থলে পুরুষের চেয়ে বেশি স্ট্রেস অনুভব করার মূল কারণ। (Prasad, 2016)

• পুরুষের মাঝে কাজ করতে সে বেশি স্ট্রেস ফিল করে, সেখানেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ২০১২ সালে ২২,০০০ নারীর ওপর এক রিসার্চে এসেছে, যেসব নারীদের চাকুরি-কেন্দ্রিক স্ট্রেস (job-related stress) বেশি, তাদের ৪০% বেশি সম্ভাবনা হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক (cardiovascular event) হওয়ার [Alexandra Sifferlin (August 25, 2015) Women in Male-Dominated Jobs Have More Stress, TIME]

• নারী কর্মকর্তারা বেশি স্ট্রেস, উদ্‌বেগ ও মানসিক সমস্যার সম্মুখীন [Why Women Feel More Stress at Work (Harvard Business Review 2016)]

• ব্রিটেনের মতো দেশেই ৭৯% নারী কর্মক্ষেত্রের স্ট্রেসে ভুগছেন, ৭৮% নারী কর্মজীবীর ঘুমে সমস্যা, মোটের ওপর ৮৭% নারী চাকুরি নিয়ে স্ট্রেসে আছেন বলে জানিয়েছেন। [Louise Chunn (Mar 26, 2019) Women Are at Breaking Point Because of Workplace Stress : Wellbeing Survey from Cigna, Forbes.com]

কিন্তু গর্ভকালে এই অতিরিক্ত স্ট্রেসটা সন্তানের জন্য বিপুল ক্ষতি নিশ্চিত করে। • স্ট্রেসের কারণে মায়ের হৃদস্পন্দন থেকে শুরু করে স্ট্রেস হরমোন, অতিমাত্রায় অক্সিডেন্ট তৈরি, রক্তচাপের বৃদ্ধি সকল জিনিস গর্ভস্থ শিশুর গঠন ও বৃদ্ধিতে নেগেটিভ প্রভাব ফেলে। যেমন: [University of Missouri-Columbia. (2016, June 7). Stress exposure during pregnancy observed in mothers of children with autism : More research needed to understand gene-stress interaction. ScienceDaily.]

• গর্ভকালীন নানান জটিলতা যেমন আগে আগেই ব্যথা ওঠা, আগে আগেই বাচ্চা হয়ে যাওয়া, কম ওজনের বাচ্চা, প্রি-এক্লাম্পশিয়া, গর্ভকালীন ডায়বেটিস ইত্যাদি এখন বেশি হচ্ছে (Coussons-Read, 2013) এই স্ট্রেসের দরুন।

• আগের চেয়ে বাচ্চাদের জন্মগত ত্রুটিও বেশি হচ্ছে। বাচ্চা হওয়ার পরও বাচ্চার সমস্যা রয়ে যাচ্ছে তার গর্ভকালীন স্ট্রেসের ফল হিসেবে। (Carmichael, 2007) বাচ্চার সম্পর্ক স্থাপনে সমস্যা, খিটখিটে মেজাজ, আবেগিক সমস্যা, অ্যাজমা, অ্যালার্জি, কম রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা, বুদ্ধিবিকাশে বাধা, স্মৃতিস্বল্পতা ইত্যাদি। (Coussons-Read, 2013)

• অটিজম রোগাক্রান্ত শিশুও বেশি জন্মাচ্ছে এই গর্ভকালীন স্ট্রেসের কারণে। (Varcin, 2017)

নারীরা পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায় না নামলেই এই অঘটনগুলো প্রতিরোধ সম্ভব। বিশেষত **১**ম ট্রাইমেস্টার, যখন সন্তানের মূল গঠন হচ্ছে, তখন মাতৃত্বকালীন ছুটিতে মেয়েরা যায় না। ফলে স্ট্রেস বেশি পড়ে, যেসময় তার বিশ্রাম বেশি প্রয়োজন ছিল।

শরীরের বিরুদ্ধে গিয়ে কর্মঘন্টা চালিয়ে যাওয়া, কর্মস্থলে স্ট্রেস-পলিটিক্স-প্রেসার পুরুষের সমানই তাকে সহ্য করতে হয়। পুরুষকে টেক্কা দিতে তারা সেটা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে করে শরীর সায় না দিলেও। এভাবেই অনাগত সন্তানের হক নষ্ট হয় মায়ের উচ্চাভিলাষের দ্বারা।

[খ]

১৯৮৬, ১৯৮৮ ও **১৯৯০** সালে পর পর ৩ টি রিসার্চের ফলাফলের উপর University of London-এর প্রোফেসর Jay Belsky সিদ্ধান্তে আসেন: বাচ্চার **১**ম বছরে যেসব মায়েরা জবে থাকে ফুলটাইম, সেসব বাচ্চার ৩ বছর, ৪ বছর ও গ্রেড-**১** এ বুদ্ধিবৃত্তিক গ্রোথ তুলনামূলক কম। এবং এসব মায়েদেরও ডিপ্রেশন হবার হার ‘বেকার’ মায়েদের চেয়ে বেশি।

সহজ করে ওনার ফাইন্ডিং-গুলো বলি:

• ছোটবয়েস থেকে দীর্ঘসময় বাচ্চাকে মা ছাড়া অন্য কারও কাছে রেখে পাললে (early and extensive nonmaternal care), পরবর্তীতে পিতামাতার সাথে সন্তানের দূরত্ব বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। সন্তানের ভিতরে রাগ-জেদ ইত্যাদি আগ্রাসী স্বভাব বৃদ্ধি পায়। বাচ্চা বয়সে, স্কুলে যাবার আগের বয়সে এবং প্রাথমিক ক্লাসগুলোতে কাঙ্ক্ষিত স্বাভাবিক বিকাশ হয় না (noncompliance)।

আগ্রহীরা মূল পেপার দেখতে পারেন:Belsky J. Emanuel Miller lecture developmental risks (still) associated with early child care. J Child Psychol Psychiatry. 2001 Oct;42(7):845-59.Brooks-Gunn, J., Han, W. J., & Waldfogel, J. (2010). First-Year Maternal Employment and Child Development in the First Seven Years. Monographs of the Society for Research in Child Development, 75(2), 7–9.

[গ]

রিসার্চ বলছে— মাতৃস্নেহ বিষয়টা সরাসরি অক্সিটোসিন হরমোনের সাথে রিলেটেড (Babchuk, 1985), যা একজন নারীর শরীরে থাকে অনেক বেশি। এই হরমোনের সাইকো-ইফেক্ট হল: বাচ্চার প্রতি মায়া। অর্থাৎ মা-শিশুর টান কেবল মানসিক না। টান শরীরে, রক্তে, হরমোনে। এজন্য মিলিয়ে নিন:

•বাচ্চার কান্নায় মায়ের অক্সিটোসিন হরমোনে বান ডাকে, ফলে মায়া উথলে ওঠে, মা ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

•বাচ্চাকে ছাড়া মায়ের খালি-খালি লাগে, মনে হয় শরীরের একটা অঙ্গ নেই।

•বাচ্চার অস্ফুট কান্না-নড়াচড়া-চেহারার ভঙ্গি-কান্নার অর্থ মা বুঝতে পারে।

•কর্মস্থলে গিয়ে বাচ্চার টান, আবার বাচ্চার কাছে থাকলে কর্মস্থলের টেনশন মাকে একটা দ্বন্দে ফেলে দেয়। না এটা হয়, না ওটা। জবের প্রোডাক্টিভিটিও কমে, ওদিকে মায়ের কাজটাও আধখেঁচড়া হল।

সুতরাং সন্তানের মায়ের প্রয়োজন বাবা-বুয়া-দাদী-নানী দিয়ে হবেনা, এটা বিজ্ঞান বলছে।]

এভাবেই শত শত বাচ্চা মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, এই বাচ্চাগুলো বড় হচ্ছে অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত বুয়ার কাছে অথবা ডে-কেয়ারে।

নেপোলিয়নের উক্তিটি সেক্যুলার লিবারেলদের কাছে বেশ জনপ্রিয়- **"তুমি আমাকে শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাকে শিক্ষিত জাতি দিবো।"**

আমাদের শিক্ষিত মায়েরা শিক্ষা অর্জন করে অফিসে ৯টা-৫টা জব করছে আর শিশুরা বড় হচ্ছে অশিক্ষিত বুয়ার কাছে। এজন্যই বোধহয় আজ সমাজের এতো অধঃপতন, নৈতিকতা ধ্বংসের পথে।

৫. পর্ণোগ্রাফি:

কেন হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্কের আজ এই বেহাল দশা? কেন এক নিদারুণ দুঃসময়ে টালমাটাল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধনগুলোর একটি? অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে এর পেছনে। পুঁজিবাদী চিন্তাভাবনা, সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে নিজের প্রবৃত্তির দাসত্ব করা, সেকুল্যারিযমের প্রসার, মিডিয়ার মগজধোলাই, নারীবাদের উত্থান...

এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হলো পর্নোগ্রাফি, আইটেম সং, নারীকে শুধু দেহসর্বস্ব ভোগের বস্তু বা "সেক্স অবজেক্ট" হিসেবে দেখানোর ট্রেন্ড, সর্বোপরি মিডিয়ার সব দিকে ব্যাপক যৌনায়ন।

আমাদের প্রজন্ম লাগামছাড়া অশ্লীলতা আর বেহায়াপনায় গা ভাসিয়েছে, অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এক-দুই ঘণ্টা ইন্টারনেটে কাটিয়েই তারা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে যত "যখন কিছুই লুকানোর থাকে না" টাইপ মেয়েদের ছবি দেখে ফেলে, তা আমাদের বাপ-

দাদারা সারা জীবনে দেখেছে কি না সন্দেহ। হাই স্পিড ইন্টারনেট, অ্যান্ড্রয়েড ফোনের কল্যাণে পর্ন ভিডিও আজ আলু-পটলের মতোই সহজলভ্য। আর আমাদের ছেলে-মেয়েরা তা গিলছেও গোগ্রাসে। প্রতি সেকেন্ডে গড়ে ২৮,২৫৮ জন মানুষ পর্ন দেখছে।৩৯

University of Montreal এর গবেষকরা, জীবনে একবারও পর্ন দেখেনি এমন একজনকেও খুঁজে পাননি। নিরাপত্তা প্রযুক্তি বিষয়ক কোম্পানি Bitdefender এর গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, পর্ন সাইটে যাতায়াত করে এমন প্রতি ১০ জনের মধ্যে ১ জনের বয়স দশ বছরের নিচে। আর এ দুধের বাচ্চাগুলো রেইপ পর্ন (ধর্ষণের চিত্রায়ণ) টাইপের জঘন্য জঘন্য সব ক্যাটাগরির পর্ন দেখে।১

পর্ন ভিডিও দেখে, চটি গল্প পড়ে বেড়ে ওঠা এসব ছেলে-মেয়েরা যৌনতা সম্পর্কে অতিরঞ্জিত, অবাস্তব ধারণা নিয়ে বড় হয়। ওদের যৌন শিক্ষার মাধ্যমও এই পর্নোগ্রাফি।

National Union of Students (NUS) এর জরিপ থেকে দেখা যাচ্ছে, স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শতকরা ৬০ জন যৌনতা সম্পর্কে জানার জন্য পর্ন ভিডিও দেখছে। ৪২

অস্ট্রেলিয়ান গবেষক মারি ক্র্যাব এবং ডেইভিড করলেট-এর ভাষ্যে,

"আমাদের সংস্কৃতিটাই এমন হয়ে গিয়েছে যে কিশোর, তরুণরা কীভাবে যৌনতাকে উপলব্ধি করবে এবং যৌনতার মুখোমুখি দাঁড়াবে সেটা শেখাচ্ছে পর্ন। যৌন শিক্ষার প্রভাবশালী মাধ্যম হয়ে গেছে পর্ন। ১৪৩

মানুষ কোনো কিছু বার বার দেখতে থাকলে এবং সেটা তার ভালো লাগলে একসময় না-একসময় সে সেটা নিজে করে দেখতে চায়। কাজেই বিয়ের পর শুরু হচ্ছে ঝামেলা। ৪৪ পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত হওয়ার কারণে বিয়ের আগেই স্বামীর মনে নারীদেহের বিভিন্ন অঙ্গের আকার-আকৃতি সম্পর্কে অতিরঞ্জিত এবং অবাস্তব ধারণা থাকে। ৪৫

তার অবচেতন মন ধরে নেয় সব নারীর দেহই পর্ন ভিডিওর অভিনেত্রীদের মতো আর বাস্তবের নারীও বিছানায় পর্ন অভিনেত্রীদের মতোই বেপরোয়া। কিন্তু সে যখন আসল সত্যটা আবিষ্কার করে, তখন হতাশ হয়ে যায় এবং দাম্পত্য জীবনে শুরু হয় অশান্তি।

মুদ্রার ওপর পিঠটাও দেখে নেয়া যাক। পর্ন ভিডিওতে আসক্ত নারীরাও ছেলেদের দেহ সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ধারণা করে বসে থাকে। বিয়ের পর যখন আবিষ্কার করে তার স্বামীর দেহ পর্ন ভিডিওতে দেখানো পুরুষদের মতো না,
-তখন সে তার স্বামীকে নিয়ে অসন্তুষ্টিতে ভোগা শুরু করে। শুরু হয় দাম্পত্য কলহ। পরকীয়ার সূত্রপাত হয়। পরকীয়ার পালে জোর হাওয়া লাগাতে ইন্ডিয়ান বস্তাপচা সিরিয়াল তো আছেই। দুজনের কেউই ভেবে দেখছে না, পর্ন ভিডিওতে যেগুলো দেখানো হচ্ছে সেগুলো কতটা বানোয়াট, কতটা এডিটিং করা। পর্ন-অভিনেত্রীদের "ফিগার" বলুন আর পর্ন-অভিনেতার বিভিন্ন অঙ্গ বলুন, সবকিছুই এডিটিংয়ের মাধ্যমে স্বাভাবিকের চেয়ে অতিরিক্ত বড় আকারে পর্ন ভিডিওতে উপস্থাপনা করা হয় অথবা অনেক ঘাম ঝরিয়ে, বিশেষ ব্যায়াম করে, সার্জারির মাধ্যমে এগুলো বড় করা হয়।

সাধারণ নারী-পুরুষের দেহ তাদের মতো হবে না এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পর্ন দেখার কারণে দর্শক এটাকেই স্বাভাবিক মনে করছে। আর ত্রিশ-চল্লিশ মিনিটের একটি পর্ন ভিডিও হয়তো এক সপ্তাহ ধরে শুটিং করা হচ্ছে, অথচ ভোক্তারা নীল স্ক্রিনের সামনে পর্ন ভিডিও দেখে ভেবে নিচ্ছেন, তারা বোধহয় এক নাগাড়েই চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিট "প্রেম" করতে পারে। পর্ন-আসক্ত স্ত্রী ভাবছে, "পর্ন ভিডিওর অভিনেতা এতক্ষণ পারলে আমার স্বামী কেন পারছে না? তার নিশ্চয় সমস্যা আছে?" পর্ন-আসক্ত স্বামী ভাবছে, "আরে সে এতক্ষণ পারলে আমি কেন পারি না? নিশ্চয় আমার কোনো সমস্যা আছে!" এইভাবে পর্ন-আসক্ত স্বামী তার আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে আর স্ত্রীরাও অসন্তুষ্টিতে ভুগছে। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসায় ভাটা পড়ছে।

বিশেষজ্ঞদের (যৌনবিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক, মনোবিদ, মনোবিজ্ঞানী, অধ্যাপক) শতাধিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে পর্ন, মারাত্মক রকমের যৌনসমস্যা সৃষ্টি করে। ৪৬ লিঙ্গোত্থানজনিত সমস্যা (erectile disfunction) থেকে শুরু করে, অকাল বীর্যপাত, যৌনতার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলা, অতৃপ্ত থাকা, স্বামী স্ত্রীর মধ্যেকার ভালোবাসা কমে যাওয়া, যৌনতায় আগ্রাসন প্রদর্শন... লম্বা লিস্ট। বর্তমান সময়ে বিশ্বজুড়ে যুবকদের যৌনসমস্যা যতটা বৃদ্ধি পেয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে কখনো এ রকম হয়নি৭ জন নেভি চিকিৎসকসহ আরও অনেক বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে লিখিত একটি গবেষণাপত্রে দেখা যাচ্ছে, ১৪ থেকে ৩৫ শতাংশ পুরুষ লিঙ্গোত্থানজনিত সমস্যায় আক্রান্ত। যৌনতায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন এমন পুরুষের সংখ্যা প্রতি এক শ জনে ১৬ থেকে ৩৭ জন। এই পুরুষদের

কারও কারও বয়স ৪০ বা তার চেয়ে কমকেউ কেউ ২৫ বছর বয়সী টগবগে যুবক, কেউ কেউ সদ্য কৈশোরে পা দেয়া টিনেইজার! ৪৭, ৪৮
ফ্রি অনলাইন পর্নোগ্রাফি যুগের আগে করা বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা গেছে ৪০ বছর বা তার চেয়ে কমবয়সী পুরুষদের মাত্র ২-৫ শতাংশ লিঙ্গোত্থানজনিত সমস্যায় আক্রান্ত। ৩৫ বছর বা তার চেয়ে কমবয়সী কেউ এ সমস্যায় আক্রান্ত, এমনটা শোনাই যেত না। তার মানে গত কয়েক বছরে তরুণ, যুবকদের মধ্যে লিঙ্গোত্থানজনিত সমস্যা বেড়েছে প্রায় ১০০০%! এর জন্য কে দায়ী?

১) ২৪ টি গবেষণায় দেখা যাচ্ছে পর্ন-আসক্তি নানা রকম যৌন জটিলতা সৃষ্টি করে। পর্ন-আসক্তদের বাস্তব জীবনে যৌনতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিলে তাদের উত্তেজিত হতে বা সার্থক যৌনমিলনের জন্য তৈরি হতে সমস্যা হয়

২) ৫৫ টিরও বেশি গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে পর্ন-আসক্তির কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার ভালোবাসা কমে যায়। যৌনজীবন নিয়ে দম্পতিরা অসন্তুষ্টি, অতৃপ্তিতে ভোগেন। ৪৯

সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে একদম তরতাজা তরুণরাও যৌনতায় অনাগ্রহ প্রকাশ করছে! সেই গবেষণাতে দাবি করা হয় পর্নোগ্রাফি এই সব তরতাজা তরুণদের যৌনতায় অনাগ্রহের পেছনে দায়ী হতে পারে।৩০

জাপানের তরুণ-তরুণীরা অত্যাধিক পর্ন-আসক্তির কারণে যৌনতার প্রতি আগ্রহ একেবারেই হারিয়ে ফেলছে। অ্যামেরিকার তরুণরা বিয়েতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন। এর পেছনে অনেকগুলো কারণের মধ্যে পর্ন-আসক্তি অন্যতম বলে বিশেষজ্ঞরা ধারণা।

পর্ন-আসক্তি বিয়ের ধারণাটাই বদলে ফেলে। বিয়েকে উপস্থাপন করে শুধু কামনা পূরণের মাধ্যম হিসেবে। বিয়ে মানে যে শুধু শারীরিক মিলনের সামাজিক স্বীকৃতি না, বিয়ে মানে দুটি মনের মিলন, সুন্দর পৃথিবীর জন্য হাতে হাত রেখে সংঘবদ্ধ লড়াই, অনেক দায়িত্ব-কর্তব্য পালন এই মৌলিক সত্যকে ভুলিয়ে দেয় পর্ন-আসক্তি। ৫২

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব তরুণরা চিন্তা করছে- “ইন্টারনেট পর্ন দিয়েই তো যৌনাকাঙ্ক্ষা মেটাতে পারছি। কী দরকার বিয়ের ঝামেলা পোহানোর কী দরকার আরেকজনের মানুষের

সাথে একই ছাদের নিচে একই বিছানা শেয়ার করার, আরেকজন মানুষের দায়িত্ব নেয়ার।"৫৩

৬. লেট ম্যারেজ:

ইসলাম যে কটি কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সর্বাগ্রে করার নির্দেশ এসেছে, তন্মধ্যে ছেলেমেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা অন্যতম।

'National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy'. তারা একটা রিপোর্ট করে 'Knot Yet: The Benefits and Costs of Delayed Marriage in America' নামে। রিপোর্টের সারাংশ হলো-

২৫ বছর বয়সে, ৪৪% নারীর প্রথম সন্তান হয়। কিন্তু ২৫ বছর বয়সে প্রথম বিয়ে করে ৩৮% নারী। [ক]

প্রথম শিশুদের ৪৮% হলো কুমারী মায়ের সন্তান। [ক]

কুমারী মায়েদের ২৩% টিনেজার। ৬০%-এর বয়স ২০-এর ঘরে।

যেসব নারী ৩০ বছর বয়স অব্দি বিয়ে না করে থাকে তারা বছরে $১৮,১৫২ (ভার্সিটি-পাশ) $৪,০৫২ (কলেজ-পাশ) বেশি আয় করে, ২০-এর আগে যারা বিয়ে করেছে তাদের চেয়ে। [ঘ]

৩০ বছরের ভেতর যে-সব ছেলের বয়স, তাদের মধ্যে যারা ২০-এর ঘরে বিয়ে করেছিল, নিজ শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুপাতে তাদের ব্যক্তিগত ইনকাম সর্বোচ্চ। মধ্য ৩০-এও যারা বিয়ে করেনি তাদের ইনকাম সর্বনিম্ন, এমনকি যারা ২০-এর আগে বিয়ে করেছে, তাদের চেয়েও কম।

চমকপ্রদ একটা ফল এসেছে-আগের যুগে যে বয়সে তরুণ-তরুণীরা বিয়ে করত, ঠিক একই বয়সে এখন তারা প্রথমে লিভ-টুগেদারে (first coresidential relationship) প্রবেশ

করছে। পার্থক্য এটাই যে, আগে বিয়ে করত, এখন বিয়ে করে না। আগে দায়িত্ব নিত, এখন নেয় না। [ক]

সন্তান আছে এবং ২০-এর ঘরে বয়স, এমন লিভ-টুগেদার দম্পতির ৪০% সন্তানের বয়স ৫ হবার আগেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। যা বিবাহিত দম্পতির চেয়ে ৩ গুণ বেশি। [ক]

শুধু ভার্সিটি-পাশ নারীই দেরিতে বিয়ে করছে তাই না, ওয়েটারের চাকরি করে এমন নারীরাও ৩০-এর আশেপাশে বিয়ে করে। [ঘ]

পশ্চিমের কালচারটাই এখন এমন, বিয়েকে তারা দেখে গাঁথনির শেষ ইট (capstone) হিসেবে, ভিতের ইট (cornerstone) হিসেবে নাপ্রাপ্তবয়স্ক জীবনের শুরু হিসেবে না, বরং সব কাজ সেরে শেষ কাজ হিসেবে বিয়েকে রাখে।
৯১% তরুণ-তরুণী ভাবে, সম্পূর্ণ আর্থিকভাবে স্বাধীন না হয়ে বিয়ে করা যাবে না।

৯০% মনে করে শিক্ষাজীবন শেষ না করে বিয়ে করা যাবে না।

৫১% মনে করে 'ক্যারিয়ার অবশ্যই আগে'। তারা ভাবে ১/২ বছর ফুলটাইম চাকরি করে বিয়ের প্রস্তুতি নিতে হবে। [ঘ]

সামাজিক পলিসি নিয়ে রিসার্চ করে-এমন একটি থিংক-ট্যাঙ্ক Urban Institute-এর একজন রিসার্চার Robert Lerman ও তাঁর সহকর্মী Avner Ahituv পেয়েছেন যে, বিয়ে একজন পুরুষের আয়কে ২০% । ২০-২৮ বছর বয়সী বিবাহিত লোকেরা জীবন নিয়ে "highly satisfied" হবার সম্ভাবনা বেশি। Authentic Happiness বইয়ে পেনসিলভ্যানিয়া ইউনিভার্সিটির

মনোবিজ্ঞানের প্রফেসর Martin E. P. Seligman, Ph.D বলেন: 'বহু রিসার্চ দেখিয়েছে যে, একটা ভালো চাকরি পাবার চেয়ে বিয়ে করাটা বেশি সুখ নিশ্চিত করে।'

University of Virginia-এর সমাজবিদ Brad Wilcox এই রিসার্চের co-authorl National Marriage Project-টাও উনিই চালান। তিনি বলেন: 'আসলে মানুষ তো আলাদা আলাদা। যদি আপনার লক্ষ্য হয় পেশাগত এবং অর্থনৈতিক সাফল্য, তাহলে দেরিতে বিয়ে

করাটাই আপনার জন্য বেস্ট। আর যদি সন্তানসন্ততি নিয়ে ধার্মিক জীবন যাপনের চিন্তা করেন, তাহলে বিশের ঘরেই বিয়ে-সন্তান সেরে ফেলা উচিত।' [১]

ঠিক এই পয়েন্টেই পুঁজিবাদী ভোগবাদী বস্তুবাদী পশ্চিমা সভ্যতার সাথে ইসলামের বিরোধ। পশ্চিমা সভ্যতা কৃত্রিম দ্বীন (জীবনব্যবস্থা)। আর ইসলাম ফিতরাতের (সহজাত স্বভাবসুলভ) দ্বীন। পশ্চিমা সভ্যতার লক্ষ্য মুনাফা আর ভোগ, জুলুম-বঞ্চনাই এ সভ্যতার হাতিয়ার। ইসলামের লক্ষ্য ইহকাল-পরকালে মুক্তি, হাতিয়ার ইনসাফ ও অধিকার বুঝিয়ে দেয়া। পশ্চিমা সভ্যতা নারী-পুরুষের বায়োলজি-বিরুদ্ধ, সাইকোলজির বিপরীত। আর ইসলাম সংগতিপূর্ণ। পশ্চিমা সভ্যতা উপর থেকে রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে বিচ্ছিন্ন মানবসত্তাকে। আর ইসলাম মানবসত্তাকে করে রাখে 'সহস্র বন্ধনের মাধ্যমে মহানন্দময়' মানুষ নিয়ন্ত্রিত হয় আত্মিকভাবে, পারিবারিকভাবে, সামাজিকভাবে যেটা প্রাকৃতিক পদ্ধতি।

৭. কুসংস্কার/কুপ্রথা:

বাংলাদেশের মুসলিম পরিবারগুলোতে যেসমস্ত কুপ্রথা রয়েছে তার মধ্যে যৌতুক অন্যতম। যৌতুক এ দেশের একটি সামাজিক অভিশাপ। যৌতুক এখন আর গরিবের ঘরেই সীমাবদ্ধ নেই। নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত বা ধনী পরিবারেও যৌতুকের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে। যৌতুকের জন্য নারীরা স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের কাছে মানসিক ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত ও অত্যাচারের শিকার। যৌতুক গ্রহণে মানুষের লোভ অনেক বড় ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে তরুন সমাজের বেশীর ভাগ যৌতুককে খারাপ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে। বাংলাদেশে হত্যাকান্ডের শিকার নারীর বিরাট অংশই যৌতুকের বলি।
বর্তমানে যৌতুক প্রথা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তা আজ আর ঐ সনাতন দাবি দাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এখন যৌতুক হিসেবে চাওয়া হয় গাড়ী, বাড়ি, ৫/১০ লক্ষ নগদ টাকা, স্বাণালঙ্কার, ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশন, সরকারী/বেসরকারী চাকুরী, উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে গমনের খরচ, বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য শ্রমিক ঘাটতি দেশে কাজ করতে যাওয়ার জন্য গ্রামাঞ্চলের বেকার ছেলেদেরকে বিদেশ পাঠানোর খরচসহ নানাবিধ দাবি দাওয়া। ছেলে পক্ষের এই দাবী মিটাতে গিয়ে কন্যা দায়গ্রস্থ পিতাকে অনেক টাকা দিতে হয়।

৮. সোশ্যাল মিডিয়া/স্মার্ট ফোন এডিকশন:

বিয়েবিচ্ছেদ ও সোশ্যাল মিডিয়া

তবে সোশ্যাল মিডিয়া যে বিপদ ডেকে আনছে, তা আমাদের ঈমানকে ধ্বংস করতে পারে। এমনকি আমাদের বৈবাহিক জীবনকেও। সেটা ফেইসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার বা স্ন্যাপচ্যাট যেটাই হোক।

সোশ্যাল মিডিয়ার কয়েকটি সমস্যা:

১. আকর্ষণ

ফেসবুক হচ্ছে নেশার মতো। ইনস্টাগ্রামও তা-ই। টুইটারও একই। সেখানে কিছু লোক পাগলামির মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এসব প্ল্যাটফর্মে আপনি স্ক্রল করতেই থাকেন, করতেই থাকেন। এটা-ওটা আসতেই থাকে! অন্তহীন বিনোদন। আপনি একজনের প্রোফাইল থেকে আরেক জনের প্রোফাইলে ঘুরছেন। তাদের সকল ছবিতে ট্যাগকৃত ব্যক্তির প্রোফাইলও দেখে আসছেনভালোই তো লাগে। স্ক্রিনে আঙুল নাড়ানো ছাড়া
আর কিছুই করতে হচ্ছে না আপনাকে

এত এত গল্প ও কৌতূহলের তুলনায় আপনার স্বামী বা স্ত্রীর কথা আপনার কাছে নিতান্ত নীরস ও বিরক্তিকর মনে হতে পারে। সেটাও আবার যদি সত্যিই স্ত্রী বা স্বামী আপনার সাথে কথা বলতে চান, তাহলে।

স্বামী হয়তো টুইটারে কোনো তুমুল তর্কযুদ্ধ দেখছে। স্ত্রী ইন্সটাতে স্ক্রল করছে অন্য মানুষের জীবনের ছবি। জড়িয়ে গেছে তাদের জীবনে। এই দম্পতিরা হয়তো একসাথে এক সোফায় বসে আছে, খাওয়া-দাওয়া করছে। কিন্তু কাছে থেকেও যেন কত দূরে। বাচ্চারা ঘুমিয়ে যাওয়ার পরেও তারা একে অপরের দিকে না তাকিয়ে ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকতে ব্যস্ত। বাস্তব জীবনে একে অপরের পরিবর্তে কথা বলছে অনলাইনে অন্য ব্যক্তির সাথে। এখানে সংযোগ কোথায়? সুখ কোথায়?

দেখা যায়, স্বামী-স্ত্রী কেউই কারও দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না বলে বৈবাহিক সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে। দুজনেই ব্যস্ত ভিন্ন দুনিয়ায়। শুরুটা হয় ধীরে ধীরে, তবে সময়ের সাথে সাথে

ধারণ করে গুরুতর আকার। যোগাযোগ, চোখাচোখি ও ঘন ঘন কথোপকথনের জায়গা নিয়ে নেয় নীরবতা আর স্ক্রিনের আলো। চোখ আঠার মতো আটকে যায় ডিভাইসে। এই মনোযোগহীনতার কোনো সামধান করা না হলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটি লক্ষণীয় দূরত্ব তৈরি হয়। হঠাৎ করেই দেখা যাবে স্ত্রী বলছেন, “আমাদের আর বনিবনা হচ্ছে না।“ স্বামী বলছেন, “আমরা একপ্রকার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি।“

২. পর্দার শিথিলতা

সোশ্যাল মিডিয়া নারী-পুরুষের মধ্যকার দেয়াল ভেঙে ফেলে। এখানে আমরা কেউই শারীরিকভাবে কারও সামনে উপস্থিত নই। বসে আছি স্ক্রিনের আড়ালে। বাস্তব জীবনে হায়া (শালীনতা) রক্ষা করা ব্যক্তিরাও সোশ্যাল মিডিয়ায় ঢিলেমি শুরু করে দেন। যেহেতু যোগাযোগটা সম্পূর্ণই ইলেকট্রনিক মাধ্যমনির্ভর।

অনেক মুসলিম ভাই-বোন বিপরীত লিঙ্গের কারও চোখে সরাসরি তাকান না। অথচ অনলাইনে এসে এদেরই কেউ কেউ নির্দ্বিধায় দেখে বিপরীত লিঙ্গের কারও ছবি অনেক মুসলিম কোনো গায়রে মাহরামের সাথে ব্যক্তিগত বিষয়ে আলাপচারিতা অপছন্দ করেন। কিন্তু অনলাইনে সেটাই একদম সহজ হয়ে যায়। শালীনতাবোধ অনলাইনে এসে হয়ে যায় শিথিল।

এ রকম হলে সম্পর্কে দ্রুতই ভাঙন ধরা শুরু করে। হঠাৎ করেই একজন পুরুষ নিজের কথা অন্য নারীর কাছে প্রকাশ করতে শুরু করেন। তার কাজের চাপ, তার হতাশা, এমনকি বাসায় স্ত্রীর সাথে তার বনিবনা না হলে শেয়ার করতে শুরু করেন সেটাও। যে নারীকে তিনি ম্যাসেজ করছেন, সেও খুব সহানুভূতিশীল শ্রোতা। স্ত্রীর কাছে যে স্বাচ্ছন্দ্য ও আবেগীয় ঘনিষ্ঠতা পাচ্ছেন না, সেটা দিচ্ছেন??? অনলাইনের এক অপরিচিত নারী।

আমরা সকলেই জানি এর শেষ কোথায়। একজন পুরুষ এবং একজন নারীর মধ্যকার সহানুভূতি নিতে পারে রোমান্টিকতার রূপ। কারণ, নির্জনে মিলিত হওয়া নারী ও পুরুষের মাঝে তৃতীয় জন হলো শয়তান। হ্যাঁ, অনলাইন নির্জনতাও নির্জনতা।

৩. বাহবা প্রাপ্তি

বেশির ভাগ নারী চায় আকর্ষণীয় হতে, আকাঙ্ক্ষিত হতে এবং সৌন্দর্যের প্রশংসা শুনতে। পুরুষদের মধ্যেও এই প্রশংসা ও স্বীকৃতির আকাঙ্ক্ষা আছে। তবে নারীদের মধ্যে বেশি। ইসলাম নারীর এই সহজাত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে দেয় বিয়ের মাধ্যমে। স্বামীই সেই পুরুষ, যিনি নারীর প্রশংসা, মনোযোগ ও সৌন্দর্যের স্বীকৃতি দেয়ার একমাত্র হালাল উৎস। তবে ক্রমবর্ধমান সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের এই যুগে কিছু নারী এই প্রশংসা পাওয়ার জন্য অনলাইনে পরপুরুষের দিকে ঝুঁকছেন।

গুণগত মানের পরিবর্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে পরিমাণ। একজন স্বামীর কাছ থেকে প্রকৃত, হালাল মনোযোগ পেতে আর ভালো লাগছে না। সেজেগুজে, বিভিন্ন ফিলটারসহ সোশ্যাল মিডিয়ায় সুন্দর সুন্দর ছবি দিয়ে অসংখ্য গায়রে মাহরামের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে। লাইক, কমেন্ট, হার্ট ইমোজির মাধ্যমে অনলাইনে যে পরিমাণ পুরুষের মনোযোগ মেলে, তার সাথে স্বামীর মনোযোগ একা পেরে ওঠে না চলতে থাকে প্রতিযোগিতার দুষ্টচক্র। আর এতে পরাজিত হচ্ছেন স্বামী।

স্ত্রী স্বামীর প্রতি বিরক্ত হয়ে যান। ভাবেন যে, স্বামী তার যথেষ্ট প্রশংসা করছেন না এখান থেকেই পরকীয়ার শুরু, শুরু ব্যভিচারের। ফলে দাম্পত্য-জীবনের ইতি ঘটে এখানেই।

তাই সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যাপারে সাবধান। আপনার বিয়ে ও পরিবারকে রক্ষা করুন এ থেকে। অনলাইন ও অফলাইনে আপনার সমস্ত ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন।

এ তো গেল দাম্পত্য জীবনে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব নিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা। সোশ্যাল মিডিয়া পারিবারিক জীবন, ব্যক্তি জীবন কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে তার কিছুটা নিচের রিপোর্টে উঠে এসেছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও পারিবারিক সম্পর্কের টানাপোড়েন: একটি মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অতিনির্ভরতা আজকের সময়ে পারিবারিক সম্পর্ক, দাম্পত্য সুখ ও শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশে গুরুতর বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। বিশেষজ্ঞদের মতে,

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক ধরনের ‘বিক্ষিপ্ত মনোযোগের ফাঁদ’, যা মানুষের আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক গঠনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে।

ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ‘বিবাহ ও পারিবারিক বিজ্ঞান’ বিভাগের অধ্যাপক ড. ড্যারেন অ্যাডামসন বলেন, “সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে এক ধরনের বাধ্যতামূলক আচরণ তৈরি হয়, যা ধীরে ধীরে আসক্তির রূপ নেয়।”

দাম্পত্য সম্পর্কে প্রযুক্তির অন্তর্ঘাত

Pew Research Center-এর এক জরিপ অনুযায়ী, ৪০ শতাংশ বৈবাহিক সঙ্গী মনে করেন, তাদের সঙ্গীর স্মার্টফোন ব্যবহারের মাত্রা তাদের বিরক্ত করে। প্রতিনিয়ত নতুন ফিচার ও ইন্টার্যাকটিভ ফাংশন যুক্ত হওয়ার ফলে এই মাধ্যমগুলো আরও আসক্তিকর হয়ে উঠছে। PsychCentral প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা যায়, আমেরিকান কলেজ শিক্ষার্থীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে কিছু সময় বিরত থাকাকে মাদক বা অ্যালকোহল থেকে সরে যাওয়ার মতোই কঠিন মনে করেন—তাদের মধ্যে উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা, এমনকি ‘উইথড্রয়াল সিম্পটমস’ দেখা যায়।

এই মাধ্যমে সাধারণত সবাই নিজের জীবনের ‘সেরা মুহূর্তগুলো’ শেয়ার করে। ফলে অনেক দম্পতি নিজেদের বাস্তব জীবনের সাধারণতা ও সমস্যাকে অন্যের অনলাইন জীবনের বাহারী রূপের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে মানসিক চাপ অনুভব করেন। এই নেতিবাচক তুলনা এবং ‘ফোমো’ (FOMO—Fear Of Missing Out) দাম্পত্য সম্পর্ক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

এ বিষয়ে প্রকাশিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা (Computers in Human Behavior) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার ও বিবাহের মানের মধ্যে সরাসরি নেতিবাচক সম্পর্ক প্রমাণ করেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব ব্যক্তি নিয়মিত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করেন না, তাদের বৈবাহিক সুখ প্রায় ১১ শতাংশ বেশি।

শিশু ও কিশোরদের ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিরূপ প্রভাব

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অতিব্যবহার শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের নয়, বরং শিশু-কিশোরদেরও শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। National Institutes of Health-এর তথ্য অনুসারে, এর ফলে শিশুরা যে ক্ষতির মুখে পড়ে, তা হলো:

* **অবসাদ ও উৎকণ্ঠা**: স্মার্টফোন ব্যবহারের সময় যত বাড়ে, এক বছর পর সেই কিশোরদের মধ্যে অবসাদ ও উদ্বেগের মাত্রাও তত বেশি দেখা যায়।
* **ঘুমের অভাব**: যেসব শিশুর শোবার ঘরে টেলিভিশন বা মোবাইল থাকে, তারা সাধারণত দেরিতে ঘুমায় এবং ঘুমের পরিমাণও কম হয়।
* **স্থূলতা**: দৈনিক ১.৫ ঘণ্টার বেশি টিভি দেখলে শিশুদের স্থূলতা ঝুঁকি বহুগুণে বেড়ে যায়। ৪ থেকে ৯ বছর বয়সী শিশুরা এতে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। যারা দৈনিক পাঁচ ঘণ্টার বেশি টিভি দেখে, তারা দুই ঘণ্টার কম টিভি দেখাদের তুলনায় পাঁচগুণ বেশি অতিরিক্ত ওজনের শিকার।
* **সাইবার বুলিং**: অনলাইন প্ল্যাটফর্মে শিশু ও কিশোররা সাইবার বুলিংয়ের শিকার হতে পারে, যা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর দীর্ঘস্থায়ী নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এমনকি, যারা বুলিং করে এবং যারা এর শিকার হয়—উভয়েই সামাজিক ও শিক্ষাগত সমস্যায় পড়ে।

প্রতিকার:

ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা:

ইতোপূর্বে আমরা এত এত সমস্যার আলোচনা করলাম। আমরা দেখেছি কীভাবে পশ্চিমা সমাজ এবং তাদের অনুকরণ করা প্রতিটি সমাজে পরিবারব্যবস্থা ধ্বংস প্রায়। বলা বাহুল্য মুসলিমবিশ্ব ও সেই পথে হাটছে। এখন সমাধান? এমন কোনো সমাধান আছে যার দ্বারা এই প্রতিটি সমস্যা একেবারে গোড়া থেকে নির্মূল করে সম্ভব? সমস্যার উদ্ভব যেন না হয় এমন কোনো সিস্টেম আছে কি? পুঁজিবাদ, নারীবাদ, অশ্লীলতা-ব্যাভিচারের ছড়াছড়ি, তাসের ঘরের মতো পরিবারগুলোর ভাঙন ঠেকানো সম্ভব?
একমাত্র সমাধান 'ইসলামী শরীয়াহ'

আমরা ওই শরীয়াহর কথা বলছি, যা নাযিল করেছেন আর-রাহমান আর-রাহীম, আল-গাফফার, আল-গাফুর, আল-ওয়াহহাব, আল-ওয়াদুদ! যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু। যিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দাতা ও অত্যন্ত স্নেহশীল। যিনি জানেন কিসে মানুষের কল্যাণ আর কোন পথটি দুর্বল মানুষের জন্য সর্বোত্তম।

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত। [তরজমা, সূরা আল-মুলক, ১৪]

ওই শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা আহ্বান করছি, যা নাযিল করেছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ, যিনি আমাদের আদেশ করেছেন সৎকর্মের এবং অন্যায়ে বাধা দেয়ার। যিনি আদেশ করেছেন আত্মীয়দের অধিকার আদায়ের, যিনি নিষিদ্ধ করেছেন অশ্লীলতা ও পাপাচার।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসংগত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা স্মরণ রাত 11 তরজমা, সূরা আন-নাহল,

৯০]

আমরা ওই শরীয়াহর কথা আলোচনা করছি, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন তার দাসদের কষ্ট লাঘবের জন্য। কারণ, তিনি আমাদের দুর্বলতা সম্পর্কে জানেন:

يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا

আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান। মানুষ দুর্বল সৃজিত হয়েছে।

[তরজমা, আন-নিসা, ২৮]

আমরা ওই শরীয়াহর কথা বলি, যা একজন পিতাকে নির্দেশ দেয় সন্তানের প্রতি স্নেহশীল হতে। আর সন্তানকে শেখায় পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণ করতে, মায়ের পদপ্রান্তে বসে তার সেবা করতে। এটা সেই শরীয়াহ, যা শাসকদের বলে প্রজাদের প্রতি নমনীয় হতে আর অন্যের বিচার করার আগে নিজের বিচার করতে।

আমরা ওই শরীয়াহর কথা বলি, যার দিকে আহ্বান করা, যা হেফাযত করা, যা কায়েম করা প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব। এটি এ উম্মাহর দায়িত্ব এবং আল্লাহ-এর নিকটবর্তী হবার জন্য আমাদের জন্য এই পথকেই নির্ধারিত করা হয়েছে। একমাত্র শরীয়াহ কায়েম করার মাধ্যমে সমগ্র উম্মাহ পারে এক অবিচ্ছেদ্য শরীরে পরিণত হবে। একমাত্র শরীয়াহ কায়েম করার মাধ্যমেই উম্মাহ পারে ওই বিশ্বব্যবস্থার দাসত্বের শেকল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে, যা ক্রমাগত উম্মাহর সম্পদ লুট করছে, আর উম্মাহকে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও রক্তাক্ত করছে।

এ হলো এমন এক শরীয়াহ, যার অধীনে রাষ্ট্র এমনভাবে ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষিত করে যেভাবে আর কোনো ব্যবস্থা করে না। শুধু একজন মুসলিমের সম্মান, অধিকার, স্বাধীনতা আর রক্ত সংরক্ষণের জন্য, ইসলামী রাষ্ট্র তার সেনাবাহিনী মোতায়েনে বাধ্য। ঠিক যেভাবে আল্লাহর রাসূল মু'তাহর যুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন, বানু কায়নুকাকে মাদিনা থেকে বহিষ্কার করেছিলেন, সাহাবা-এর কাছ থেকে আমৃত্যু জিহাদের শপথ নিয়েছিলেন বাইয়াতুর রিদ্বওয়ানের দিনে এবং উসামা (রা -এর বাহিনীকে প্রেরণ করেছিলেন। প্রতিটি মুসলিম বন্দীকে মুক্ত করা, প্রতিটি মুসলিমের রক্তের প্রতিশোধ নেয়া এই রাষ্ট্রের দায়িত্ব, এই শরীয়াহর দাবি।

আমরা ওই শরীয়াহর কথা বলি, যা মুসলিমদের ধন-সম্পদ লুট করে সুইস ব্যাংকে টাকার পাহাড়, আর মালেয়শিয়ায় সেকেন্ড হোম বানানোয় বাধা দেবে। আমরা ওই শরীয়াহর কথা বলি, যা দেশের জনগণের হাড়ভাঙা খাটনির মাধ্যমে উপার্জিত, অশ্রু-রক্ত-ঘামে ভেজা হাজার হাজার কোটি টাকার গায়েব হয়ে যাওয়া ঠেকাবে: অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি দেবে, সে যে-ই হোক। এ এমন এক শরীয়াহ যা নারীপুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, সবার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, নিরাপত্তা, সম্মান এবং শিক্ষা নিশ্চিত করবে। বাস্তবে, শুধু ছাপার অক্ষরে না। আমরা এমন ব্যবস্থার প্রতি আহ্বান করি যে ব্যবস্থায় আলিশান দালানকোঠার সামনেই ডাস্টবিনে কুকুরের পাশে খাবারের খোঁজে ব্যস্ত মানুষ থাকবে না। এ এমন এক ব্যবস্থা, যা নিশ্চিত করবে, জনগণও তা-ই পাবে, যা প্রশাসক পাবে।

এ হলো এমন এক শরীয়াহ, যা অবাধ যৌনতা, লাম্পট্য আর যিনার সবকের বদলে কিশোর-কিশোরীদের শেখাবে সতীত্ব, সম্মান ও দায়িত্ববোধের সঠিক নির্দেশনা। এমন শরীয়াহ, যা পুরুষকে শেখায় দৃষ্টি অবনত রাখতে এবং নারীকে সম্মান করতে। আর নারীকে শেখায় তার সৌন্দর্য ঢেকে রাখার দ্বারা আল্লাহপ্রদত্ত আভিজাত্যপূর্ণ মর্যাদা বজায় রাখতে। এ হলো এমন এক শরীয়াহ, যা সস্তা পণ্যের মতো বিলবোর্ড, ম্যাগাযিন, পর্দায় আর স্টেডিয়ামে নারীদেহের প্রদর্শনকে বাধা দেয়। উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদনার বদলে বিশ্বাস, ভ্রাতৃত্ব, আল্লাহভীতি, কল্যাণকামিতা ও পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে তৈরি সম্পর্কের মাধ্যমে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে উম্মাহকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রতি আহ্বান করে।

আমরা ওই শরীয়াহর প্রতি আহ্বান জানাই, যা নিশ্চিত করে কোনো খ্যাতিলোভী লেখক নামে কিংবা বেনামে আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর দ্বীন ও তাঁর রাসূল-কে অবমাননা করা তো দূরে থাক, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে একটি অক্ষরও লেখার সাহস করবে না।

আমরা ওই শরীয়াহর প্রতি আহ্বান জানাই, যা মাতাল, নেশাখোর, ধর্ষক ও বিকৃতকামীদের অপরাধ, অনাচার ও অজাচার থেকে সমাজকে রক্ষা করে। ওই শরীয়াহ, যা ছাত্রী হোস্টেলের ট্রাঙ্কে বন্দী আর ডাস্টবিনে পলিথিনে প্যাঁচানো পরিত্যক্ত শিশুদের অধিকার রক্ষা করবে।

এমন শরীয়াহ, যা বৃদ্ধাশ্রমে পরিত্যক্ত, বড় থেকে বড় ডিগ্রিধারীদের হতভাগ্য বাবা-মাকে তাদের প্রাপ্য সম্মান দেবে।

শান্তি রক্ষার নামে নারী-শিশুদের শরীর নিয়ে 'শান্তিকামী' যুদ্ধবাজদের নারকীয় অসুস্থতায় মেতে ওঠার লাইসেন্স দেয় না এই শরীয়াহ। একদিকে শান্তি, গণতন্ত্র আর অধিকারের অস্পষ্ট আদর্শিক বুলি শুনিয়ে অন্যদিকে খুঁজে ফেরে না মানুষ মারার নিত্যনতুন উপায়। কাগুজে শান্তির কথা বলে সাম্রাজ্যবাদী লুটপাট চালায় না বিশ্বজুড়ে।এ এমন কোনো আদর্শ না, যা মানুষকে পশুর কাতারে নামিয়ে এনে আবার সেই পশুর ওপর দেবত্ব আরোপ করে। এ এমন কোনো দর্শন না.যা ভোগ আর শারীরিক সুখের মাপকাঠিতে ভালোমন্দের হিসেব কষে। এ ব্যবস্থা বস্তুর উপাসনা আর সাফল্যকে বাড়ি-গাড়ি-বেতনের পাল্লায় মাপতে শেখায় না। ভোগের মন্ত্র যপে মানুষকে বন্দী করে না উদয়াস্ত ইঁদুর দৌড়ে। উন্নয়ন আর অগ্রগতির ভুল সংজ্ঞায়নে সভ্যতাকে ঠেলে দেয় না ধ্বংসের মুখে।

বরং এ ব্যবস্থা আল্লাহর যমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ওয়াহির আলোকে সত্যিকার অর্থে শান্তি নিশ্চিত করে। এ ব্যবস্থা প্রত্যেককে ওই অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়, যা তার জন্য আল্লাহ নির্ধারিত করেছেন। কল্পজগতের কারিকুরি আর কাগুজে তাত্ত্বিকতার বদলে এ শরীয়াহ বাস্তবে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। সমাজকে সঠিক পথ ও পদ্ধতির দিশা দেয়। ভাসা-ভাসা তত্ত্বকথার বদলে বাস্তবসম্মত সমাধান দেয় এ ব্যবস্থা এ ব্যবস্থা মানুষের দুনিয়াকে জুড়ে দেয় আখিরাতের সাথে।

এই হলো আল্লাহর শরীয়াহ! যা সুস্থ জীবন, বিকাশ ও শিক্ষা নিশ্চিত করে। যা নিরাপত্তা দেয় জান, মাল, সম্মান ও অধিকারের। এই হলো শরীয়াহ, যা বিশুদ্ধ, মর্যাদাপূর্ণ, কল্যাণময়, নমনীয় এবং বরকতপূর্ণ।

আমরা এই শরীয়াহর কথা বলি। মাতাল প্রাচ্যবিদদের নেশাতুর তন্দ্রার দুঃস্বপ্নের কথা বলি না।

আজ এই বিশ্ব, এই উম্মাহ, উম্মাহর প্রতিটি পরিবার যে সমস্যা গুলোর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তার সমাধান একমাত্র শরীয়াহ কায়েমের মাধ্যমেই সম্ভব। ইসলামী রাষ্ট্র ই পারে ঘরে ঘরে ইসলামী পরিবারব্যবস্থা নিশ্চিত করতে, উম্মাহকে আবার তার গৌরবোজ্জ্বল সময় ফিরিয়ে নিতে।
সবচেয়ে পরিপূর্ণভাবে যে সমাজ শরীয়াহ কায়েম করেছিল তা হচ্ছে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বি আল্লাহু আনহুম আজমাইন দের সমাজ।

ইতিহাস সাক্ষী! ইসলাম আত্মপ্রকাশের প্রায় ৫০ বছরের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম সেসময়ের সুপারপাওয়ারদের পরাজিত করে ইসলামের কালেমা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রায় অর্ধবিশ্বে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো স্পষ্ট নির্দেশনা আমাদের দিয়েই গেছেন—সর্বোত্তম আমার যুগ, এর পরের যুগ, তার পরের যুগ। এরপর মিথ্যা প্রকাশ পাবে।

বর্তমান বিশ্বে শরীয়াহ কায়েমের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত আফগানিস্তান। শরীয়াহ কীভাবে আফগানিস্তানকে বদলে দিয়েছে তার ছোট্ট একটি উদাহরণ দিয়ে শেষ করছিঃ

"২০০০ এর মাঝামাঝি তালিবান নেতা মুল্লাহ মুহাম্মাদ উমার ঘোষণা করেন আফগানিস্তানে আর কোনো পপি চাষ হবে না। পৃথিবীর মোট পপির প্রায় ৯০ এবং হেরোইনের প্রায় ৭০% আসে আফগানিস্তান থেকে। তাই এ ধরনের ঘোষণার প্রতিফলন বাস্তবে কতটুকু ঘটবে এ নিয়ে প্রশ্ন ছিল শুরু থেকেই। বিশেষ করে ত্রিশের দশকে অ্যামেরিকার মদ নিষিদ্ধ করার পলিসির ব্যর্থতার উদাহরণ বিশ্বের সামনে থাকার কারণে।কিন্তু বিস্ময়করভাবে ১ বছরের মাথায় তালিবান নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে পপি চাষ ৯৯% কমে এল। কীভাবে তালিবান এই অসাধ্য সাধন করল?

তালিবানের মাদকবিরোধী অভিযানের মোটাদাগে চারটি মূলনীতি পাওয়া যায়:

১. মাদক এবং মাদক উৎপাদনের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান ব্যাপকভাবে প্রচার করা; জনমত তৈরি,

২. শরীয়াহ অনুযায়ী অপরাধীর দ্রুত ও কঠোর শাস্তির হুমকি,

৩. তৃণমূল পর্যায়ে মনিটরিং এবং পপি খেত ধ্বংস করা; ব্যর্থতার জন্য চাষিদের পাশপাশি তৃণমূলের দায়িত্বশীলদের শাস্তির ব্যবস্থা করা,

৪. অপরাধীদের পাবলিকলি শাস্তি দেয়া ও অপমানিত করা।

আইনশৃঙ্খলা বা অপরাধ পরিস্থিতির বদলে তালিবান পুরো ব্যাপারটাকে অ্যাপ্রোচ করল শরীয়াহর হুকুম বাস্তবায়ন হিসেবে।আধুনিক সভ্য সফিসটিকেইটেড অ্যামেরিকান রাষ্ট্রযন্ত্র যেখানে ব্যর্থ বর্বর মধ্যযুগীয় আনকালচারড জঙ্গি তালিবান সেখানে সফল হলো। কান্দাহার

আর হেলমান্দের কৃষকরা শুরু করল না খেয়ে মারা গেলেও তারা আর কখনো পপি চাষ করবে না। অপরাধের সাথে যুক্ত বিশাল একটা অংশকে তারা অপরাধ ছেড়ে দিতে কনভিন্স করলো রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব কিংবা মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে না এটা করা হল আল্লাহর সার্বভৌম আইনের কথা মানুষের কাছে তুলে ধরার মাধ্যমে।

'আমাদের হাতে অস্ত্র আছে, আর কেবল আমাদেরই অস্ত্র ব্যবহারের অধিকার আছে, তাই আমরা যা বলব তা-ই আইন', আধুনিক জাতিরাষ্ট্রর এ মেসেজের বদলে বলা হল-'আসমান ও যমিনের মালিক এ কাজ হারাম করেছেন, আর আল্লাহর যমিনে আল্লাহর আইনই চলবে। যে আল্লাহর আইন মানবে না সে আখিরাতে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করবে আর দুনিয়াতে, আমরা শরীয়াহ অনুযায়ী তাদের বিচার করব। এর চেয়ে বিন্দুমাত্র কম বা বেশি করার এখতিয়ার আমাদের নেই।

তালিবান মানুষের সামনে এমন একটি আদর্শ দিলো যা তাদের ত্যাগ স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করল। তালিবান এমন একটি বিচারব্যবস্থা এবং প্রশাসন গড়ে তুলল যেখানে আসলেই বিচার হয়, অপরাধী যে-ই হোক না কেন। এবং তারা এমন একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলল যা পশ্চিমের গড়ে তোলা গ্লোবাল সিস্টেমের কর্তৃত্ব স্বীকার করে না, আর তাই গ্লোবাল ড্রাগ ইন্ডাস্ট্রির মূল প্লেয়ারদের তোয়াজ করাকেও দরকার মনে করে না। ভালো ও মন্দের মানবরচিত পরিবর্তনশীল সংজ্ঞার বদলে তারা নিজেদের কাজগুলোকে সাজাল পরম, ধ্রুব সংজ্ঞার কাঠামোতে। অপরাধীও স্বীকার করল সে যা করছে তা আসলেই অপরাধ। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, ক্ষমতাসীনদের দেয়া সংজ্ঞা, মানবরচিত আইন কিংবা নির্বাচনী হিসেব-নিকেশের কারণে না, তারা স্বীকার করল কারণ সৃষ্টিজগতের মালিক বলেছেন এটা অপরাধ।

আধুনিক ইতিহাসে এর চেয়ে সফল আর কোনো মাদকবিরোধী অভিযানের দৃষ্টান্ত নেই।

এটা কি তালিবানের কৃতিত্ব? না, এটা আসমান ও যমিনের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নাযিলকৃত শরীয়াহর সৌন্দর্য। পশ্চিমা সেক্যুলার মানবরচিত আইনের বদলে তালিবান আল্লাহর শরীয়াহ বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছিল, তাঁদের কৃতিত্ব এটুকুই।

২০০১ সালে অ্যামেরিকার আফগানিস্তান আক্রমণের পর আফিম উৎপাদন আবার আগের অবস্থায় ফেরত যায়। ২০১৭ সালে উৎপাদিত হয় আফগান ইতিহাসে সর্বোচ্চ পরিমাণ হেরোইন।"

তাকওয়া/শারঈ পর্দা:

খলীফাহ উমার একবার আরেক সাহাবী উবাই ইবনু কা'বকে (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)

প্রশ্ন করেছিলেন,

তাকওয়া কী?

জবাবে উবাই রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনি কখনো কাঁটা বিছানো পথে হেঁটেছেন?

-হ্যাঁ।

কীভাবে হেঁটেছেন?

-খুব সাবধানে, কষ্ট সহ্য করে হেঁটেছি, যাতে আমার শরীরে কাঁটা বিঁধে না যায়।

এটাই হলো তাকওয়া। [৩৯০]

কাঁটা বিছানো পথে মানুষ যেভাবে সতর্ক হয়ে চলে, ঠিক সেভাবে আখিরাতের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য হারাম থেকে বেঁচে থাকা আর পুরস্কারের জন্য আল্লাহ যা ভালোবাসেন, সেই আমল করার নাম তাকওয়া।

তাকওয়ার এই কনসেপ্টটা যদি আমরা বুঝতে পারি, যদি বসিয়ে নিতে পারি নিজের মনে ও মস্তিষ্কে, তাহলে এতোক্ষণ আল্লাহ প্রদত্ত বিধানসমূহ বোঝা এবং মানার ব্যাপারটা সহজ হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেছেন,

‘নিশ্চয় আল্লাহ তাকওয়া অবলম্বনকারী মুত্তাকিনদের ভালোবাসেন।[৯১]
‘যে তাকওয়া অবলম্বন করলো, আল্লাহ তার জন্যে কাজগুলোকে সহজ করে দেবেন। [৩৯২]

শাইখ ইবনু বায ও শাইখ ইবনু উসাইমীন রাহিমাহুমাল্লাহ নারী-পুরুষের দেখাদেখি, নির্জনে অবস্থান ও সহাবস্থান সংক্রান্ত বিবিধ আলোচনায় বলেছেন,

নবী)ﷺ(-এর যুগে নারীগণ পুরুষদের সাথে সহাবস্থান করতেন না, মসজিদেও না, আর বাজারেও না নবী (সাঃ)-এর মসজিদে নারীরা পুরুষদের পেছনে, পুরুষদের শেষ কাতারের পরের কাতারে সালাত আদায় করতেন এবং তিনি নারীদের প্রথম সারি বা কাতারের সাথে পুরুষদের শেষ কাতারের ফিতনার আশঙ্কা থেকে সতর্ক করার জন্য বলতেন:

‘নারীদের সর্বোত্তম সারি বা কাতার হলো শেষ কাতার এবং সবচেয়ে মন্দ কাতার হলো তাদের প্রথম কাতার, আর পুরুষদের সর্বোত্তম কাতার হলো প্রথম কাতার এবং সবচেয়ে মন্দ কাতার হলো তাদের শেষ কাতার।‘[৩৬৯]

আর নবী ()-এর যুগে পুরুষদেরকে (মসজিদ থেকে) প্রস্থানের সময় বিলম্ব করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হতো, যাতে নারীগণ প্রস্থান করতে পারে এবং মসজিদ থেকে তারা এমনভাবে বের হতে পারে যাতে মসজিদের দরজায় তাদের সাথে পুরুষগণ মিশতে না পারে। রাস্তায় পথ চলার সময় পরস্পরের মাঝে সংস্পর্শের দ্বারা ফিতনার আশঙ্কা থেকে সাবধান ও সতর্ক করার জন্য নারীদেরকে রাস্তাজুড়ে চলতে নিষেধ করা হতো, রাস্তার প্রান্তসীমায় চলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হতো অথচ তাঁরা পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে সকলে ঈমান ও তাকওয়ার যে মানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সে হিসেবে তাদের পরবর্তীগণের অবস্থা কেমন হওয়া উচিত?’[৩৭০]

ইবনুল জাওযী (রহ.) যেমনটা বলছেন,

‘রোগ সারানোর চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করাই সব থেকে উত্তম। প্রথম পর্যায়ে করণীয় হলো বিবাহ বহির্ভূত দুই নারী পুরুষের নির্জনে দেখা সাক্ষাৎ না করা ও কথাবার্তা না বলা।‘ ৩৭১]

কাজেই প্রেম-যিনা থেকে বাঁচার জন্য আমাদের অবশ্যই প্রকাশ্য এবং গোপন ফ্রি-মিক্সিং থেকে বাঁচতে হবে। পর্দা করতে হবে, দৃষ্টির হিফাযত করতে হবে।

যে স্যারের প্রাইভেটে বা কোচিং-এ মেয়েরা থাকে সেই স্যারের প্রাইভেট বা কোচিং জমজমাট হয়- এমনটা আমরা দেখে আসছি সেই ছোটবেলা থেকেই। অধিকাংশ প্রেমেরই সূচনা হয় এভাবে সহশিক্ষা (কো-এডুকেশন) থেকে। তাই স্কুল, কলেজ, ভার্সিটি, কোচিং- সবকিছু বয়েস অনলি বা গার্লস অনলি রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে । কো-এডুকেশনের চাইতে ছেলে মেয়ে আলাদা আলাদা থাকলে পড়াশোনাও ভালো হয়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে চোখের হিফাযত করা, ফ্রি-মিক্সিং এড়ানো আসলে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটি। এক্ষেত্রে করণীয়:

১। ক্লাসে কখনোই বিপরীত লিঙ্গের কারো সাথে না বসা; কেউ পাশে এসে বসলে, উঠে অন্য বেঞ্চে চলে যেতে হবে।

২। বিপরীত লিঙ্গের কারো সাথে কথা না বলা, নাম জিজ্ঞেস করারও দরকার নেই। কেউ কথা বলতে আসলেও যেনো ত

আমার ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে পারে, আমি কথা বলতে আগ্রহী না। বিপরীত লিঙ্গের কাউকে ফ্রেন্ডলিস্টে না রাখা কেউ মেসেজ দিলেও সিন না করা গ্রুপ স্টাডি করবো না।

৩। পর্দা ছাড়া বা পর্দাসহ ছেলে মেয়ে ছবি তোলা পর্দার খেলাফ এবং শরীয়াহর সীমানা বহির্ভূত মেলামেশা। পর্দা করেও ছেলেমেয়ে একসাথে ছবি তোলা যাবে না। বান্ধবীদের সাথেও গ্রুপ ছবি না তোলা কোনো বান্ধবী যদি সিঙ্গেল ছবিও তুলতে চায়, তুলতে দেওয়া যাবে না। কারণ, এসব ছবির গন্তব্য হয় সোশ্যাল মিডিয়ায় অথবা তার ফোন থেকে তার ভাই, স্বামী বা অন্য কেউ তা দেখে ফেলতে পারে।

৪। বার্থডে সেলিব্রেশন, র‍্যাগ ডে বা এরকম অন্য কোনো অনুষ্ঠানের নামে রং মাখামাখি, ছেলে মেয়ের একে অপরের টিশার্টে অশ্লীল মন্তব্য লেখা টাইপ কোনো ধরনের কোনো কাজে অংশগ্রহণ করা যাবে না

৫। ছেলেমেয়েদের আড্ডায় কখনো অংশ নেওয়া যাবে না, ট্যুর যদি ফ্রি-মিক্সিং এর হয়, তাহলে যাওয়া যাবে না।

৬। বন্ধুত্ব করার আগে যাচাই করে নিতে হবে। কারণ মানুষ তার বন্ধুর দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং সচ্চরিত্রের মানুষদের সাথেই বন্ধুত্ব করা যাবে না।

৭। ছেলেদের দাড়ি রাখতে হবে, প্যান্ট টাখনুর উপরে, পোশাক-আশাকে সুন্নাহ মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে। মেয়েদেরও শরীয়াহ অনুযায়ী পরিপূর্ণভাবে পর্দা করতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

'আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে, আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, তবে যা সাধারণত প্রকাশ থাকেআর তারা তাদের গলা ও বুক যেন মাথার কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখে। [৩৭৩]

'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে নাআর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [৩৭৪]

রাসূলুল্লাহ (সা এর বেশ বিখ্যাত একটা হাদীস আছে। তিনি বলেছেন,

'দুই প্রকার জাহান্নামি মানুষ আসবে; যাদেরকে আমি আমার যুগে দেখতে পাচ্ছি না। এক প্রকার হলো, ঐ সব নারী যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ থাকবে। তারা পুরুষকে আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও অন্য পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট থাকবে। তাদের মাথার খোঁপা উটের কুঁজের মতো (উঁচু, যা) এদিক-ওদিক হেলানো থাকবে।

তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না; এমনকি তারা জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না অথচ,
জান্নাতের সুঘ্রাণ ৫শ' বছর রাস্তার দূরত্ব থেকেও অনুভব করা যাবে। ৩৭৫]

পূর্বসূরি পুণ্যবতী নারীদের অনুসরণ:

আমরা পূর্বসূরী পুণ্যবান মনীষীদের ইতিহাস পড়ে তাদের কষ্ট-ক্লেশ, জ্ঞান অর্জন, ইবাদাত-বন্দেগী, দুনিয়াবিমুখতা এবং আকাশছোঁয়া মনোবল দেখে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে যাই। প্রকৃতপক্ষে এখানে আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ, তাঁরা এমন নারীদের জঠরে জন্মেছেন, এমন পবিত্র নারীদের দুধপান করেছেন, এমন নিষ্ঠাবান নারীদের ছত্রছায়ায় লালিত-পালিত হয়েছেন, যাঁরা নিজেরাই ছিলেন আল্লাহর ওলী। তাঁরা নিজেরাই একেক জাতির সমতুল্য ছিলেন। তাহলে কেন তাদের সন্তানাদি এমন হবেন না? কেন আমগাছে আম-ই ফলবে না? আল্লাহর ওলীদের গর্ভ থেকে আল্লাহর ওলী বের হবেন, এ আর আশ্চর্যের কী!

উম্মাহর আজকের দুরবস্থা থেকে মুক্তির উপায় পূর্বসূরি পুণ্যবতী নারীদের জীবনীতেই রয়েছে। তারা নিজেরাই ছিলেন একা এক উম্মাহ। তারাই ধারণ করেছেন উম্মাহর বাকি অর্ধেক। তারা সেই বীরদের জননী যারা ইতিহাসের পাতায় আজও স্বর্নাক্ষরে লিপিবদ্ধ। উম্মাহর নারীদের মাতৃত্বকে জিহাদ হিসেবে নিতে হবে। এবং উম্মুল মুমিনীন, নারী সাহাবাগণ ও পূর্ববর্তী পুণ্যবতী নারীদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তবেই উম্মাহ আবার সালাহউদ্দীন আইয়ুবি রাহিমাহুল্লাহ এর মতো বীরদের ফিরে পাবে।

(আয়েশা রাঃ) :

আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা, নবী কারীম এ-এর প্রিয়তমা স্ত্রী, ছিলেন ফকীহা, আল্লাহওয়ালী এবং সাত আকাশের উপর (সবার কাছে) তিনি পূতপবিত্র। নবীজির ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স উনিশও পার হয়নি।

তবুও পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষ তাঁর ইলম থেকে উপকৃত হয়েছেন। তাঁর এককভাবে বর্ণনাকৃত হাদীস জালের মতো বিস্তীর্ণ। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর মতো এত অধিক-সংখ্যক হাদীস উম্মতের কাছে বর্ণনা করেছেন-এমন সাহাবী আর কেউ নেই। বরং তিনি আবু হুরায়রার চেয়েও প্রাজ্ঞ ও বেশি বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন।

ইমাম যুহরী বলেন, 'যদি আয়েশা -এর জ্ঞান গোটা নারীকুলের সবার জ্ঞানের সাথে মেলানো হয়, তাহলে তাঁর জ্ঞানই সর্বসেরা হবে।' [১]

আতা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আয়েশা দুই একজন ফকীহা এবং সর্বোত্তম সিদ্ধান্তদাতা ছিলেন।[২]

উরওয়া ইবনুয যুবাইর বলেন, 'ফিকাহশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা এবং আরবী কাব্যগীতি সম্পর্কে আয়েশা-এর চেয়ে প্রাজ্ঞ আমি অন্য কাউকে দেখিনি।' [৩]

আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'নবী কারীম-এর সাহাবীদের কাছে কখনো কোনো হাদীস যদি অস্পষ্ট মনে হতো, তাহলে তাঁরা আয়েশা -কে জিজ্ঞাসা করলে সঠিক সমাধান পেয়ে যেতেন। [৪]

ইমাম মাসরুক বলেন, 'নবীজি -এর বড় বড় সাহাবীকে আমি দেখেছি, তাঁরা আয়েশা থেকে 'ফারায়িয' (উত্তরাধিকার বণ্টন) সংক্রান্ত বিষয় জেনে নিতেন। 101

ইমাম মাসরুককে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আয়েশা কি 'ফারায়িয' সংক্রান্ত বিষয়ে ভালো জ্ঞান রাখেন?' প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, 'আল্লাহর শপথ, আমি রাসূল (সা -এর বড় বড় বুযুর্গ সাহাবীকে দেখেছি, তাঁরা 'ফারায়িয' সংক্রান্ত বিষয়ে উম্মুল মুমিনীন আয়েশার কাছ থেকে সিদ্ধান্ত নিতেন।''

হাফিয আবু হাফস উমর ইবনু আবদিল মাজীদ তাঁর রচিত ইজাহু মা লা ইয়াসাউল মুহাদ্দিসু জাহলাহু গ্রন্থে বলেছেন, 'সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে আহকাম (বিধিবিধান) সংক্রান্ত এক হাজার ২০০টি হাদীস রয়েছে। এই দুটো কিতাবে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা দুইশ আশিরও ঊর্ধ্বে। সেগুলোর মধ্যে খুব কমই আহকাম (বিধিবিধান) বিষয়ের বাইরে।'

হাকিম আবু আবদিল্লাহ বলেন, 'শরীয়তের এক-চতুর্থাংশ (বিষয়াদি) আয়েশা থেকেই পাওয়া গেছে।'

তিনি ছিলেন মুজতাহিদা (কুরআন-হাদীস থেকে শরীয়তের বিষয়াদি উদঘাটনকারী) নারী। আল্লাহর কিতাবের সূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে তাঁর ছিল কার্যকর অন্তর্দৃষ্টি। খুব ভালো কুরআন তিলাওয়াত করতে পারতেন। সাহাবায়ে কেরামের সকলের মাঝে এসব গুণাবলি একসাথে

পাওয়া যেত না। বিশেষ কয়েকজন সাহাবী ছিলেন, যাঁদের মাঝে এসকল গুণাবলির সবকটির অপূর্ব সমন্বয় ছিল। আম্মাজান ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম একজন।

নবী কারীম-এর সাহাবীদের মতামতের ওপর তাঁর অনেক মন্তব্য ও সংশোধনী ছিল। তাঁরা যখন এ ব্যাপারগুলো সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে পারতেন, তখন তাঁরা আম্মাজানের মতটাই মেনে নিতেন। [৩]

নারীরা তাঁর বাড়ি আসতেন দ্বীন শিখতে। সেই মাখযুমী গোত্রের নারী, যাঁর হাত কেটে দেওয়া হয়েছিল, তিনি আম্মাজান থেকে হাদীস থেকে বর্ণনা করতেন। 'হাত কাটার পর থেকে তিনি ইলম অর্জনের জন্য আয়েশা -এর বাড়ি আসতেন।' [৪]

যুগ পরম্পরায় এমন অনেক মহিয়সী নারীকে পাওয়া যায়, যাঁরা ফরযে আইন (আবশ্যকীয়) পরিমাণ বিদ্যার্জন থেকে এগিয়ে ফরযে কিফায়া (অতিরিক্ত) পরিমাণ বিদ্যার্জনের প্রতিও ঝুঁকেছিলেন। তাঁদের মাঝে ছিলেন অনেক বড় বড় হাদীস বিশারদ। এমনকি তাঁদের থেকে হাদীসের ইজাযত পাবার জন্য পুরুষ মুহাদ্দিসদেরও ভিড় লেগে থাকত।

৮ খণ্ডের কাবীর কিতাবের লেখক ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সাদ তাঁর কিতাবের একটি খণ্ড শুধু নারী হাদীস বিশারদদের বর্ণনা নিয়ে সাজিয়েছেন। সেখানে তিনি সাতশোর অধিক নারী মুহাদ্দিসের নাম উল্লেখ করেছেন যাঁরা রাসূল থেকে বা তাঁর সাহাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তাঁদের থেকে বর্ণনা করেছেন মুসলিম উম্মাহর ইলমী কাননের মান্যবর ইমামগণ।

ফাকীহা, যাহিদাহ উম্মুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'সবকিছুতেই আমার ইবাদাত-বন্দেগী খোঁজার একটা ঝোঁক থাকে। তবে আমি উলামায়ে কেরামের মজলিস এবং তাঁদের পরস্পরের আলোচনা-পর্যালোচনার চেয়ে আমার অন্তরের জন্য প্রশান্তিদায়ক অন্য কিছু পাইনি।' [১]

আসমা বিনতু আবি বকর

উম্মু আবদিল্লাহ আল-কুরাইশিয়্যাহ আত-তাইমিয়্যাহ। তিনি খলীফাতুল মুসলিমীন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু’র সম্মানিত মাতা এবং উম্মুল মুমিনীন আয়েশা -এর বোন ছিলেন। যাতুন নিতাকাইন (দুই ফিতাওয়ালী) নামে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন সবার কাছে, নিজ ওড়না দুটুকরো করে নবীজি এষ্ট্র ও আবু বকর ২-এর জন্য হিজরতের সামান বেঁধে দিয়েছিলেন উপাধি লাভ করেছিলেন। মুহাজির নারী-পুরুষদের মধ্যে তিনিই সর্বশেষ মদীনায় হিজরত করেছিলেন।

ইবনু আবি মুলাইকাহ বলেন, ‘আসমা -এর মাথাব্যথার রোগ ছিল। মাঝেমাঝে তিনি মাথায় হাত রেখে বলতেন, “হায়, আমার কত গুনাহ! অবশ্যই আল্লাহ তাআলা (পাহাড়সম) গুনাহও ক্ষমা করেন।” (১)

ফাতিমা বিনতু আল-মুনজির বলেন, ‘আসমা সকল দাস-দাসী আযাদ করে দিয়েছিলেন। একবার রোগাক্রান্ত হয়ে তাঁর

মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির বলেন, ‘আসমা ছিলেন একজন দানশীলা নারী।‘

রুকাইন ইবনুর রাবী বলেন, ‘আমি আসমা বিনতু আবি বকরের বার্ধক্যকালে তাঁর কাছে গিয়ে দেখি তিনি এই বয়সেও অত্যধিক নফল নামায পড়ছেন।‘

তিনি তখন ৯৭ বছর বয়সে উপনীত হয়েছেন। তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় খিলাফতের ঘোষণা দিয়েছেন। সিরিয়ার খিলাফতের অধীনে হাজ্জাজ এসেছে মক্কা আক্রমণ করতে। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে, তাঁর দুই পুত্রও গিয়ে যোগ দিয়েছে শত্রুপক্ষে। শেষবারের মতো গেলেন মা আসমা বিনতু আবি বকরের কাছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কী করণীয়? আত্মসমর্পণ করে সিরিয়ার খিলাফতে বাইআত

[১] আলী আল-কারনী-হা-কাযা আল্লামাতনিল হায়াত-৮৯-৯১

দেবেন, নাকি সত্যের জন্য জীবন দেবেন?

আসমা বললেন, 'তুমি নিজেই নিজের সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানো। তুমি যদি মনে করো সঠিক পথে আছ এবং লোকজনকে সঠিক পথের দিকে আহ্বান করছ, তাহলে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করা পর্যন্ত তুমি অটল থাকো আর যদি দুনিয়ার ক্ষমতার প্রতি তোমার কোনো মোহ থাকে, তাহলে তোমার চেয়ে নিকৃষ্ট আর কেউ নেই। তুমি নিজেও ধ্বংস হবে এবং তোমার সঙ্গীদেরকেও ধ্বংস করবে।

আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর বললেন, 'আম্মা, দুনিয়ার কোনো মোহ আমার নেই। কারো প্রতি কখনো অত্যাচার আমি করিনি কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আমার অন্তরের কথা এবং আমার নিয়ত আল্লাহ তাআলাই জানেন।'

মা বললেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। আল্লাহ তাআলার কাছে আমি আশাবাদী, যদি তুমি তাঁর কাছে আমার আগেই চলে যাও তাহলে তোমার ব্যাপারে আমার শোক কল্যাণকর হবে।'

মা-ছেলে দুজনই সেরে নিলেন বিদায়ী মুলাকাত। মা বললেন, বেটা, কাছে এসো। আমি তোমার শরীরের ঘ্রাণ নেব। তোমাকে শেষবারের মতো একটু বুকে জড়াব।'

আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর তাঁর সামনে ঝুঁকে গেলেন। তাঁর চেহারায় চুমু দিলেন। দুজনেই অঝোর ধারায় কাঁদছিলেন। মা ছিলেন অন্ধ, চোখে দেখতেন না। ছেলেকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে নিলেন। তারপর হাত সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'তুমি কী গায়ে দিয়েছ?'

বললেন, 'লোহার বর্ম।'

'বেটা, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার জন্য শহীদ হতে চায়, তার এই পোশাকের কী প্রয়োজন! খুলে ফেলো। তাহলে তোমার ক্ষিপ্রতা আরও শক্তিশালী হবে, অস্ত্রচালনা করতে সহজ হবে। বরং তুমি একটা মোটা পায়জামা পরে নাও, যাতে ধরাশায়ী হয়ে গেলেও সতর না খোলে।'

ছেলে চলে গেলেন, এদিকে মা হাত তুললেন আকাশে। 'আল্লাহ, আপনি তার দীর্ঘক্ষণ ইবাদাত-বন্দেগী করার উপর দয়া করুন। অন্ধকার রাতে, মানুষজন

ঘুমিয়ে থাকার সময় তার রোনাজারি করার উপর আপনি রহম করুন। রোজা অবস্থায় মক্কা-মদীনার দ্বিপ্রহরের খরতাপে তার তৃষা ও ক্ষুধার্ত থাকার উপর আপনি রহম করুন। আল্লাহ! আমি আমার ছেলেকে আপনার হাতে সোপর্দ করে দিলাম। তার ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্তের প্রতি আমি সন্তুষ্ট আছি। আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের প্রতিদান দান করুন

নজীরবিহীন বীরত্ব প্রদর্শন করে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হলেন। তাঁর মরদেহ মক্কার 'হাজুন' পর্বতের সুউচ্চ চূড়ার মতো জায়গায় শূলবিদ্ধ করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।

৯৭ বছর বয়সী মা পথ হাতড়ে হাতড়ে শূলবিদ্ধ ছেলের লাশের কাছে চলে এলেন, পাহাড়ের চূড়ায়। ছেলের জন্য দুআ করলেন। খুনি হাজ্জাজ সামনে এসে বলল, 'হে আমার মা, খলীফা আমাকে আপনার সাথে সর্বোত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। আসমা চিৎকার করে বললেন, 'আমি তোমার মা নই। আমি এই শূলবিদ্ধ লোকটার মা। আর (আজকেই শেষ নয়) সব বাদী-বিবাদীরা একদিন আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হবেই হবে।'

ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে এলেন। বললেন, 'আল্লাহকে ভয় করুন। এই বিপদে ধৈর্য ধরুন।' আসমা জবাবে বললেন, 'হে ইবনু উমর, ধৈর্যধারণ কেন করব না? আমাকে তো বনী ইসরাঈলের পাপিষ্ঠদের হাতে নিহত নবী ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া'র মতো একজন নেতা দেওয়া হয়েছে (নিজ ছেলেকে বুঝালেন)।'

পাঠক, দেখুন, কী পরিবার! কত মহান মা, কত মহান ছেলে, কত মহান পিতা! আল্লাহ যাতুন নিতাকাইন রাদিয়াল্লাহু আনহা'র উপর রহম করুন। ইবনুয যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র উপর রহম করুন পিতা যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র উপর রহম করুন আল্লাহ আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু'র প্রতি দয়া করুন।

আল্লাহ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সাহাবী ও উম্মুল মুমিনীনদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন।

উম্মুল মুমিনীন **হাফসা**

মর্যাদার দিক দিয়ে তিনি নবী কারীম-এর কাছে আয়েশা-এর সমপর্যায়ের ছিলেনতিনি পরহেযগার এবং কৃতজ্ঞতাপরায়ণ নারী ছিলেন। ছিলেন পিতা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু’র মতোই স্পষ্টভাষী এবং ক্ষেত্রবিশেষে চটজলদি কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণে অভ্যস্ত। তাঁর এই স্বভাবজাত আভিজাত্যের দরুন একবার তাঁর প্রতি অভিমান করে রাসূল সতর্কতামূলক তাঁকে এক তালাকে রজঈ প্রদান করেনপরে জিবরীলে আমীনের অনুরোধে নবীজি তা ফিরিয়ে নিয়ে তাঁকে আবার আপন সম্মানে সমাসীন করেন[৪] একবার ভেবে দেখুন! স্বয়ং জিবরাঈল তাঁর ব্যাপারে সুপারিশ করতে চলে এসেছেন!

জিবরীলে আমীন তাঁর গুণকীর্তন করে বলেন, ‘তিনি রোযাদারনামাযী নারী তিনিই হবেন আপনার জান্নাতের সঙ্গিনী।’’ তাহলে হাফসা বিনতু ফারুকের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা এবং জিবরীলে আমীনের প্রশংসা-বাণীর চেয়ে দামি আর কী হতে পারে!

সালাহউদ্দীন আইয়ুবী’র বোন

শাইখ আতিয়্যাহ মুহাম্মাদ সালিম বলেন, ‘আমি ইহসা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ছিলামতখন আমি স্বয়ং আলে মুবারকের (মুবারকের পরিবারের) কাছে সুনানু আবি দাউদের একটি কপি দেখতে পেলাম। তাতে সালাহউদ্দীন আইয়ুবী’র বোনের লেখা টীকা যুক্ত ছিল। [৩]

বলা ভালো, ইমাম ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাও ফাতিমা বিনতু জাওহারের ছাত্র ছিলেন। [৪]

যাঁদের পবিত্র স্মৃতি আমরা এতক্ষণ রোমন্থন করলাম, নারী যদি হয় এঁদের মতো, তাহলে সে নারী পুরুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব পাওয়ার অধিকার রাখে। শামস (সূর্য) স্ত্রীলিঙ্গ বাচক হলেও এতে কোনো দোষ নেই। হিলাল (চাঁদ) পুংলিঙ্গ বাচক হলেও এতে গর্বের কিছু নেই।

উম্মু উমারাহ-এর বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ:

উম্মু উমারাহ নাসীবাহ বিনতু কাআব। তিনি আনসারদের খাযরাযী গোত্রীয় প্রখ্যাত মুজাহিদা সাহাবী। তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনু কাআব আল-মাযিনী রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন

বদরী সাহাবী এবং তাঁর আরেক ভাই আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অত্যন্ত ইবাদাতগুজার ও পরহেযগার সাহাবী। উম্মু উমারাহ 'লাইলাতুল আকাবা'য় উপস্থিত ছিলেন। এরপর থেকে তিনি উহুদ, হুদায়বিয়া, হুনাইন, ইয়ামামা-সহ বিভিন্ন যুদ্ধে সশস্ত্র অংশগ্রহণ করেন। আর যুদ্ধের ময়দানেই তাঁর হাত কাটা পড়েছিল।

উহুদের যুদ্ধে নাসীবাহ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশপাশে যুদ্ধরত ছিলেন। নবীজির উপর কোনো আঘাতের সম্ভাবনা দেখা দিলেই তিনি তা প্রতিহত করছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি
ডান-বাম যেদিকেই তাকাই দেখি সে আমার আশপাশেই যুদ্ধ করছে।' তাঁর দুই ছেলে ও স্বামীও তাঁর পাশে ছিলেন
তাঁর ছেলে উমারাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'সেদিন আমি আমার বাম বাহুতে আঘাত পাই। খেজুর গাছের মতো বিশালদেহী এক লোক আমাকে আঘাত করে পরে সে আর আমার কাছে থামেনিআমাকে রেখেই চলে যায়ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছিল আমার। নবী কারীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, "তুমি ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে নাও।" তখন মা আমার কাছে এলেন। তাঁর (কোমরের) দুই পাশে অনেকগুলো পট্টি রাখা ছিলতিনি সেগুলো মুজাহিদদের ক্ষতস্থানের জন্য নিয়েছিলেন সেখান থেকে একটি পট্টি খুলে আমার ক্ষতস্থানে বেঁধে দিলেন। নবীজি তা কাছ থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন।

'পট্টি লাগিয়ে মা (উম্মু উমারাহ) বললেন, "বেটা, যাও, শত্রুদের আঘাত করো।" তখন নবীজি বললেন, "হে উম্মু উমারাহ, তুমি যা করতে সক্ষম, তা আর কে করতে পারবে!"" উম্মু উমারাহ বলেন, 'যে লোকটা আমার ছেলেকে আঘাত করেছিল সে এদিকে আসছিল। রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিয়ে দিলেন, "এই লোকটাই তোমার ছেলেকে আঘাত করেছে।"" উম্মু উমারাহ বলেন, 'আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লামতার পায়ে আঘাত করলাম। সে পড়ে গেল। তখন নবী কারীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়ে দেখি, তিনি হাসছেন এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁত অবধি বেরিয়ে গেল। তিনি বলছিলেন, "উম্মু উমারাহ, চালিয়ে যাও।" তারপর আমরা তাকে আঘাতের পর আঘাত করে হত্যা করে ফেলি। শেষে নবী কারীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি তোমাকে সফলতা দিয়েছেন এবং তোমাকে শত্রু থেকে নিরাপদ রেখেছেন। আর তোমার সামনে প্রিয়জনের আঘাতকারীকে উপস্থিত করেছেন।"

নাসীবাহ (উম্মু উমারাহ) সেদিন ১৩টি আঘাত পেয়েছিলেনতাঁর কাঁধে একটি গভীর ক্ষত হয়েছিল। শরীর থেকে অঝোর ধারায় নির্গত রক্তের কোনো তোয়াক্কা তাঁর ছিল না। প্রখর বজ্রের মতো শত্রুদের কাতারে কাতারে ঢুকে হামলা করে যাচ্ছিলেন। তাঁর কোনো ক্লান্তি ছিল না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমারাহকে লক্ষ করে বললেন, 'তোমার মা... তোমার মা তার ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে দাও। আল্লাহ তাআলা তোমাদের পরিবারে বরকত দান । তোমার মায়ের মর্যাদা অমুক অমুকের চেয়েও উচ্চে।'

নবীজির এই দুআ শুনে উম্মু উমারাহ নিবেদন করলেন, '(হে আল্লাহর রাসূল) আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন আমরা জান্নাতে আপনার সঙ্গী হতে পারি।' নবীজি দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ, আপনি তাদেরকে জান্নাতে আমার সঙ্গী বানিয়ে দিনউম্মু উমারার খুশি তখন দেখে কে! বললেন, 'দুনিয়ার কষ্টে এখন আমার আর কী আসে যায়।' ১৯

উম্মু উমারার আরেক ছেলে ছিলেন হাবীব বিন যায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। ভণ্ডনবী মুসাইলিমার হাতে বন্দী হয়েছিলেন। শয়তানটা তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এক এক করে কেটে নিচ্ছিল, যেন তিনি মুরতাদ হয়ে যান। কিন্তু তিনি দ্বীনের উপর অটল থেকেই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন। মা উম্মু উমারার কাছে সন্তান নিহত হওয়ার খবর আসে তিনি একে মনে করলেন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সওয়াবের কারণ। আর রক্তশপথ করলেন, তিনি মুসাইলিমাকে হত্যা করবেন। হয় নিজে মরবেন, নয়তো মুসাইলিমা মরবে।

অতঃপর মুসাইলিমার বিরুদ্ধে 'ইয়ামামা'র যুদ্ধে যান। এই যুদ্ধেই মুসাইলিমা নিহত হয়। বার্ধক্যসত্ত্বেও সেখানে বীরোচিত ভূমিকা রেখেছিলেন। যুদ্ধ করতে করতে হাতও কাটা পড়েছিল। হাত কাটা ছাড়াও তিনি আরও ১৪টি আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত বেরিয়েই যাচ্ছিল। এভাবেই তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যায়।

[১] যাহাবী-সিয়ারু আ'লামিন নুবালা-২/২৯০

[২] যাহাবী-সিয়ারু আ'লামিন নুবালা-২/২৯২

সুমাইয়া (রা

কেবল এতটুকু থেকেই তাঁদের অদম্য স্পৃহার পরিচয় মেলে যে, ইসলামে সর্বপ্রথম শহীদ হয়েছিলেন একজন নারী। আম্মার ইবনু ইয়াসিরের মা সুমাইয়া (রা

ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে ইবনু সাআদ বর্ণনা করেন, ‘ইসলামে সর্বপ্রথম শহীদ নারী ছিলেন আম্মার ইবনু ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু’র মা সুমাইয়া। তিনি ছিলেন বয়স্ক দুর্বল বৃদ্ধা। বদর-যুদ্ধে আবু জাহাল মারা যাওয়ার পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন, “আল্লাহ তোমার মায়ের খুনিকে হত্যা করেছেন।“ আম্মার ইবনু ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু’র মা সুমাইয়া বিনতু খুব্বাত রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন ইসলামগ্রহণকারীদের মধ্যে সপ্তম নারী। উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরের সময় যখন কাঠফাটা রোদের উত্তাপে মাটি উত্তপ্ত হতো, তখন বনু মাখযুম গোত্রের লোকেরা তাঁকে, তাঁর ছেলে ও স্বামীসহ মরুভূমিতে নিয়ে আসত। তাঁদেরকে লোহার বর্ম পরিধান করাত। তারপর এর উপর উত্তপ্ত বালু ঢেলে দিতো। কখনো তাদেরকে পাথর দ্বারা আঘাত করত।

মক্কার উত্তপ্ত ফাঁকা মাঠে তাঁদেরকে এমন নির্মম নির্যাতনের সময় একদিন নবী কারীম এ আম্মার ও আম্মারের বাবা-মায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, ‘হে ইয়াসিরের পরিবার, ধৈর্য ধরো। তোমাদের আবাসস্থল হচ্ছে জান্নাত।‘ [১]

অগত্যা বাপ-বেটা উভয়ে মুখে কুফরি কথা প্রকাশ করে এই তিক্ত নির্যাতন থেকে রেহাই পেলেন। কিন্তু তাঁদের অন্তর ছিল ঈমানে ভরপুর। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে ক্ষমা করে তাঁদের উপমা দিয়ে বলেছেন-

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ

‘তবে হ্যাঁ, যাকে (কুফরি কথা বলতে) বাধ্য করা হয়, অথচ তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে (তার কথা ভিন্ন)।‘

কিন্তু মা? তিনি ধৈর্যের পরিচয় দিলেন। নির্যাতন সহ্য করলেন। জালিমদের কাঙ্ক্ষিত বাসনা-ঈমান আনার পর আবার কুফরিতে ফিরে যাবেন, তিনি তাদের এ আশা পূরণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। ফলে জালিমরা তাঁর জীবনটাই নিয়ে নিল। ভয়ঙ্করভাবে তাঁর রক্তপাত ঘটাল।

পাপিষ্ঠ আবু জাহাল ইবনু হিশাম তাঁর লজ্জাস্থানে বর্শা বিদ্ধ করল। তিনি শহীদ হলেন, ইসলামের প্রথম শহীদ।

সাফিয়্যাহ বিনতু আবদিল মুত্তালিব, প্রিয় ভাইয়ের নির্মম শাহাদাতে তাঁর ধৈর্য

পাঠক, সাফিয়্যাহ বিনতু আবদিল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহা'র বীরত্বের কথা আমরা কে না শুনেছি। তাঁর কোলে তাঁর ছেলে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রেখেই স্বামী ইন্তেকাল করেছিলেন। নবীজির ফুপুদের মধ্যে তিনিই ইসলাম কবুল করেছিলেন বলে জানা যায়। জীবনের ৬০টি বসন্ত পার হয়ে যাওয়ার পর হিজরতকারীদের সাথে হিজরত করেছিলেন। উহুদের ময়দানে তাঁর ভাতিজা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ছেলে যুবাইর এবং ভাই হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র সাথে যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন।

উহুদ-যুদ্ধে যখন মুসলমানরা চতুর্দিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেন, তখন এই নারী আহত সিংহীর মতো গর্জে ওঠেন। পশ্চাদপসরণকারী একজনের কাছ থেকে বল্লম ছিনিয়ে নেন কাতার ভেঙে সামনে আসতে থাকেন এবং সিংহীর হুঙ্কার ছেড়ে বলেন, 'তোমাদের ধ্বংস হোক। তোমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রেখে পিছু হটে যাচ্ছ।'

নবী কারীম তখন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, 'তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো মুশরিকরা তাঁর ভাই হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকৃত করে ফেলেছে (দেখলে সহ্য করতে পারবেন না)। যুবাইর তাঁর মা সাফিয়্যাকে ডেকে বললেন, মা, এদিকে আসুন মা, এদিকে আসুন।' তিনি বললেন, 'আমার কাছ থেকে সরে যাও। তোমার কোনো মা নেই। তুমি নবীজিকে রেখে পেছনে সরে যাচ্ছ?' ছেলে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল আপনাকে ফিরে যেতে বলেছেন।' তিনি বললেন, 'সকল সিদ্ধান্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। সবাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের সামনে থেমে যায় (আমিও থেমে গেলাম)।' তিনি আরও বললেন, 'আমি শুনতে পেয়েছি আমার ভাইয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকৃত করে ফেলা হয়েছে। এটা হয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহ তাআলার রাস্তায়। সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য।'

ফুপু নিজেকে সামলে নিয়েছেন বুঝতে পেরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যাহ -এর ছেলে যুবাইরকে বললেন, 'তাঁকে যেতে দাও।' যখন যুদ্ধের ভয়াবহতা কমে এল, সাফিয়্যাহ ভাই হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র পাশে গিয়ে মহান ব্যক্তিদের সামনে দাঁড়ানোর মতো (সম্মান প্রদর্শন) করে দাঁড়ালেন। সায়্যিদুনা হামযা'র পেট ফেড়ে ফেলা হয়েছিল। ভেতর

থেকে কলিজা বের করা হয়েছিল। নাক কেটে দেওয়া হয়েছিল। উভয় কান কেটে দেওয়া হয়েছিল। চেহারাকেও বিকৃত করে ফেলা হয়েছিল।

সাফিয়্যাহ ভাইয়ের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এবং প্রশান্ত চিত্তে বললেন: 'নিশ্চয়ই এটা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য হয়েছে।
আর আমি আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট আছি।' তাঁর দুচোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরছিল। আর তাঁর অন্তরে দাউদাউ করে জ্বলছিল ব্যথার আগুন। 'চোখ দিয়ে যে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে তা চোখের পানি নয়, তা যেন অন্তরের পানি ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরছে।' তিনি বলছিলেন'আমি ধৈর্য ধরব... আল্লাহ তাআলা চাইলে এর উত্তম বিনিময় আমি পাব... আমি ধৈর্য ধরব... আল্লাহ তাআলা চাইলে এর উত্তম বিনিময় আমি পাব...'

এই ছিল সাফিয়্যা -এর অন্তরের জোর।

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন। তিনি ছিলেন মুসলিম মায়েদের জন্য অনন্য দৃষ্টান্ত। তিনি একাই ছেলেকে প্রতিপালন করেছেন, ভাইয়ের মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণ করেছেন। ইসলামের ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম নারী, যিনি একজন মুশরিককে হত্যা করেছেন। এই মুসলিম জাতির মাঝে তাঁর মতো আরও অনেক নারীরই জন্ম হয়েছে, এমন না, বরং তাঁর মতো অনেক পুরুষেরও জন্ম হয়েছে। আজ উম্মাহর পুরুষগুলো সাফিয়্যা'র মতো যদি হতো, বদলে যেত পৃথিবীর চেহারা।

তারবিয়্যাহ:

তারবিয়াহ কী?

তারবিয়াহ হলো আপনার সন্তানকে ইসলাম শিক্ষা দেওয়া—তাত্ত্বিকভাবে এবং ব্যবহারিকভাবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামকে বাস্তবায়ন করা। সন্তানকে সঠিক-ভুল, হালাল-হারাম শেখানো। কেন এবং কীভাবে—এই প্রশ্নগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা, উদাহরণ, গল্পের মাধ্যমে বুঝিয়ে বলা। যাতে ছোট শিশুরাও সহজে বুঝতে পারে ও গ্রহণ করতে পারে।

তাদের মধ্যে আদব, শিষ্টাচার ও দৃঢ় নৈতিকতা গড়ে তোলা। কীভাবে বসতে হয়, দাঁড়াতে হয়, খেতে হয়, পান করতে হয়, পরিধান করতে হয়, বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান জানাতে হয়, ছোটদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে হয়, এবং কীভাবে মানুষের সঙ্গে—বন্ধু হোক বা শত্রু—আচরণ করতে হয়, তা শেখানো।

বিপক্ষে গেলেও কীভাবে সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে হয়, সবাই ছেড়ে গেলেও কীভাবে হকের ওপর অবিচল থাকতে হয়, তা শেখানো। জীবন্ত উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা আমাদের প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), সাহাবাগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এবং অন্যান্য নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) জীবনের ঘটনা।

সবকিছুই কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সংযুক্ত করে শেখানো। প্রতিটি সূরার আয়াত ও সিরাতের ঘটনা যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে।

সন্তানের সঙ্গে গল্প করা, মজা করা, হাসি-ঠাট্টা, খেলা করা, তাদের লম্বা বর্ণনা ধৈর্য ধরে শোনা এবং উদ্ভট প্রশ্নগুলোরও সৎভাবে উত্তর দেওয়া—সবই তারবিয়াহর অংশ।

এইভাবে আপনি আপনার সন্তানদের সঙ্গে একটি দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলবেন—আর তাদের হৃদয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গে যুক্ত হবে।

**সঠিক ইসলামি তারবিয়াহ মানে হলো আপনার সন্তানের হৃদয় থেকে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে একটি মজবুত সুতোর বন্ধন তৈরি করা।

মায়ের তারবিয়্যাহ সন্তানকে নিয়ে যেতে পারে উম্মাহর নেতৃত্বের আসনে। তার উজ্জ্বল উদাহরণ আমাদের সালাফদের থেকে দেকগে নেওয়া যাক:

মা হচ্ছেন মহাপুরুষ তৈরির নির্মাণশিল্পী-

এমন এক যুগ বিগত হয়েছে, যেসময় মুসলমানদের ক্ষমতা-বিক্রম, প্রভাব-প্রতিপত্তি, বিদ্যা-বুদ্ধি, জ্ঞান-প্রজ্ঞা ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বময়তারা বিশ্ববাসীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তাগুতের রাজদরবার বিধ্বস্ত করেছে। আন্দালুস থেকে কাশগড়, সোমালিয়া থেকে তাতারিস্তান পর্যন্ত কালিমার পতাকা স্থাপন করেছে। বিশ্বময় ছড়িয়েছে নিজেদের ধর্ম, রীতিনীতি, ভাষা, বিদ্যা-বুদ্ধি, সভ্যতা। কোন বিদ্যালয়ে তাদের পড়াশোনা? কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে তাদের গ্রাজুয়েশন?

দ্বীনী চেতনার বাহক সেইসব মুজাহিদ-দাঈ-আলিম-শাসকের প্রথম বিদ্যালয় ছিল তাঁদের পুণ্যবতী মায়েদের কোল। ফল দিয়ে ছায়া দিয়ে আগলে নিয়েছেন উম্মাহকে। কৃতিত্ব তো সেই মালিনীদের যাঁরা দ্বীনের প্রাথমিক আদর্শ, আল্লাহ-রাসূলের ভালোবাসা, কুরআন-সুন্নাহর গুরুত্ব ও মর্যাদা সেই কচি মনে পুঁতে দিয়েছিলেন।

এই পুণ্যবতীদের মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলা উম্মাহকে আদর্শহীন হয়ে বেড়ে ওঠা থেকে রক্ষা করেছিলেন।
পথহারা জাতিকে পথ দেখান একজন মা-ই তাঁর নাড়িছেঁড়া বাতিখানি উচ্চে ধরে। আর মা যদি হন উদাসীন-চরিত্রহীনা-অবাধ্য-বেদ্বীন, তাহলে ধুতরা গাছ থেকে ধুতরা ফল ছাড়া আর কী আশা করতে পারে উম্মাহ?

এই মনীষীরা মহিয়সী মুসলিম মায়েদের অবদান-

যুবাইর ইবনুল আওয়াম ও তাঁর সন্তানেরা

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী যুবাইর ইবনুল আওয়াম-এর কথাই ধরা যাক। তিনি তাঁর নির্ভীক সাহসিকতায় এই পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন যে, তাঁকে একাই এক হাজার বীরের সমপরিমাণ ধরা হতো। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মিশরে যুদ্ধরত মুসলিম সেনাবাহিনীর

জন্য অতিরিক্ত সাহায্য হিসেবে তাঁকে পাঠালেন, তখন পত্রমারফত জানিয়ে দিলেন মিশরের সেনাপতি আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে-

'পর সমাচার, আমি আপনার কাছে প্রত্যেক এক হাজার সৈন্যের মুকাবিলায় চার হাজার (চার জন) সৈন্য পাঠালাম। তাদের প্রত্যেকেই এক হাজার সৈন্যের সমপরিমাণ। তারা হলেন: যুবাইর ইবনুল আওয়াম, মিকদাদ ইবনু আমর, উবাদাহ ইবনুস সামিত এবং মাসলামাহ ইবনু খালিদ। ১৯

সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল উমর-এর প্রখর অন্তর্দৃষ্টি। ইতিহাস লিপিবদ্ধ রেখেছে, যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু শুধু এক হাজার সৈন্যের সমপরিমাণ ছিলেন না; বরং তিনি একাই গোটা একটা জাতির সমপরিমাণ ছিলেন। তিনি মুসলিম সেনাবাহিনীর গতিরোধকারী দুর্গে একাই প্রবেশ করেছিলেন। দালান বেয়ে উপরে উঠে সেখান থেকে একাই লাফিয়ে পড়েন শত্রুদের মাঝে। 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিয়ে দুর্গের ফটকের দিকে ধাবিত হলেন। জীবনের পরোয়া না করে খুলে দিলেন ফটক। মুসলমানরা একযোগে দুর্গের ভেতর প্রবেশ বিপুল বিক্রমে পরাস্ত করলেন শত্রুদের।

আসুন, পরিচয় করিয়ে দিই এই বীরের মায়ের সাথে। জানতে চান কোন সিংহীর কোলে জন্মেছেন এমন সিংহ? নবীজি এ-এর চাচা হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলা হয় 'আসাদুল্লাহ ও আসাদুর রাসূল' (আল্লাহ ও নবীর সিংহ)। তাঁর শখও ছিল সিংহ-শিকার। সেই হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র আপন বোন, নবীজির ফুফু সাফিয়্যাহ বিনতু রাদিয়াল্লাহু আনহা। সিংহের বোন এই সিংহী ছিলেন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মাতা।

এই সাহসিনী মায়ের কোলেই প্রতিপালিত হয়েছেন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু। মা তাঁকে একজন সিপাহী এবং একজন অশ্বারোহী হিসেবে প্রতিপালন করেছেন। ধনুক মেরামত করা এবং তির চালনাকে তাঁর খেলার বস্তু বানিয়ে দিয়েছেন। সবধরনের ভয়ংকর জায়গায় তির নিক্ষেপ করার প্রশিক্ষণ তাঁকে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে প্রত্যেক বিপজ্জনক জায়গায় ঢুকিয়ে দিতেন।

যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন পিছিয়ে যেতেন তিনি তাঁকে কঠিন শাস্তি দিতেন। এমনকি যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র এক চাচা থেকে এ-কারণে সাফিয়্যাহকে তিরস্কার পর্যন্ত শুনতে

হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, ‘আপনি তাকে একজন বিদ্বেষী নারীর ন্যায় শাসন করছেন, কোনো মায়ের শাসন তাকে করছেন না।‘

তিনি এর জবাবে বলেছিলেন-

‘যে ব্যক্তি বলে আমি যুবাইরের সাথে বিদ্বেষমূলক আচরণ করি, সে মিথ্যা বলে। আমি তাঁকে শাসন করি যেন সে ক্ষিপ্ত হয়। ফলে দুশমন পরাজিত হবে আর সে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে ফিরে আসবে।‘ [১]

শ্রেষ্ঠ মনীষী আবদুল্লাহ, মুনযির, উরওয়া-এঁরা সবাই যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু’র সন্তান। তাঁরাও ছিলেন তাঁদের মা আসমা বিনতু আবি বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা’র মেজাযের। হাজ্জাজ আক্রমণ করেছে মক্কাখলীফা আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে। মায়ের কাছে এলেন শেষ পরামর্শ নিতে। মায়ের পরামর্শ কী ছিল জানেন? বেটা, বর্ম খুলে যুদ্ধে যাও, শাহাদাতপ্রার্থীর জন্য এসব মানায় না।‘

এমন মায়ের সন্তান এঁরা। ২

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু

আমিরুল মুমিনীন আলী ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু দুই জোড়া বাহুডোরে প্রতিপালিত হয়েছেন, যে দুই জোড়া বাহুতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ প্রশান্তি ও যত্ন লাভ করেছেনতাঁর মা ফাতিমা বিনতু আসাদ রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন নবীজির চাচি, আবু তালিবের স্ত্রী। আর নারীকুলশ্রেষ্ঠা আম্মাজান খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহা’র ঘরে আদর-যত্নে তিনি বড় হয়েছেন। এই দুই মহৎপ্রাণ নারীর পবিত্র প্রভাবেই আলী হয়েছেন আলী মুরতাযা। রাদিয়াল্লাহু আনহু।

আবদুল্লাহ ইবনু জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু

তিনি ছিলেন আরবের বদান্যশীলদের সর্দার। যুবসমাজের মাঝে বিচক্ষণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। তাঁর বাবা জাফর ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহ তাঁকে মায়ের কোলে রেখেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তাঁর মা আসমা বিনতু উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু’র প্রতিপালনে বেড়ে ওঠেন।

অত্যন্ত তেজস্বিনী নারী ছিলেন। হাবশায় হিজরতকারীদের অতিরিক্ত ফযীলতের হাদীসটি তাঁর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র বাকবিতণ্ডার ফলে নবীজি উচ্চারণ করেন। [১] চিকিৎসাবিদ্যায় ছিলেন প্রসিদ্ধ।

মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু

আমীরুল মুমিনীন মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কথাই ধরা যাক। তাঁর মা হিন্দ বিনতু উতবাহ ছিলেন অত্যন্ত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারী। কুফরের উপর অটল ছিলেন আভিজাত্যের কারণে, দ্বীনে প্রবেশের পরও আত্মমর্যাদা দেখিয়েছেন দ্বীনের খাতিরে। নবীজির হাতে বাইআতের সময় নবীজি যখন বলছিলেন: 'বলো, যিনা করব না।' তাঁর উত্তর ছিল 'স্বাধীন সম্ভ্রান্ত নারী আবার যিনা করে নাকি?' অত্যন্ত আত্মমর্যাদার কথাবাইআত শেষে হিন্দ বলেন: 'আগে আপনার চেয়ে বড় কোনো দুশমন আমার ছিল না আর এখন আপনার চেয়ে প্রিয় আমার কাছে আর কেউ নেই। হিন্দ তো আর আগের হিন্দ নেই। [২] ইয়ারমুকের যুদ্ধে স্বামী আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে অংশ নেন। যুদ্ধের প্রথমদিকে পলায়নরত মুসলিম সেনাদের অপমান করে মেরে পিটিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাচ্ছিলেন গায়রতের কারণে। [৩]

কোলের শিশু মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে তিনি বলতেন, 'যদি মুয়াবিয়া তার জাতির নেতৃত্ব না দেয়, তাহলে আমি সন্তান হারানোর ব্যথা অনুভব করব।'। সন্তানকে তিনি এমনভাবে বড় করেছেন, সেই আত্মবিশ্বাসের পরিচয় তাঁর এই কথাটি: 'আল্লাহর শপথ, যদি গোটা আরববাসী একত্র হয়ে মুয়াবিয়ার ওপর একযোগে তির নিক্ষেপ করতে থাকে তারপরও সে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা খুঁজে নেবে।' [2]

মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে কেউ বিবাদে লিপ্ত হতো, তখন তিনি তাঁর মায়ের প্রতি সম্পৃক্ত করে প্রতিপক্ষের কানে বলতেন, 'আমি কিন্তু হিন্দের ছেলে।'১৯

উম্মু উমারা'র সন্তানগণ

তাঁর এক ছেলে আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদ আল-মাযিনী রাদিয়াল্লাহু আনহু ভণ্ড নবী মুসাইলিমাহকে হত্যা করেছেন। তিনি 'হাররাহ'-এর যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। এবং তাঁর ভাই

হাবীব ইবনু যায়িদ ইবনি আসিম আল-মাযিনী, মুসাইলিমার হাতে শহীদ হনতাঁরা উভয়েই ছিলেন এই শ্রেষ্ঠ মায়ের অবদান। তিনি হলেন উম্মু উমারাহ। [২]

আকাবার বাইআত থেকে শুরু করে উহুদ, হুদায়বিয়া, হুনাইন, ইয়ামামাহ'র যুদ্ধে সশস্ত্র অংশগ্রহণ করেছেন। নবীজি বলেন, 'আজ (উহুদ-যুদ্ধের দিন) নাসীবাহ বিনতু কাআবের (উম্মু উমারা) অবস্থান অমুক অমুকের চেয়ে উত্তম।' তিনি মুসাইলিমার বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধে একটি হাতও হারান। ৩।

খলীফা উমর ইবনু আবদিল আযীয

তাঁকেও অনেক আলিম খুলাফায়ে রাশিদীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। তাঁর মা ছিলেন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র নাতনী-উম্মু আসিম বিনতু আসিম ইবনি উমর ইবনিল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি সমসাময়িক নারীদের মাঝে সর্বদিক থেকেই পূর্ণতার অধিকারী এবং হৃদ্যতায় সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। উম্মু আসিমের মা-কে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ছেলে আসিমের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। তিনি উঁচু বংশীয়া ছিলেন না, কিন্তু দুধে পানি মেশানোর ব্যাপারে তাঁর মাকে উপদেশ দেওয়ার মধ্য দিয়ে যে সততা প্রদর্শন করেছিলেন, তা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মুগ্ধ করেছিল। এই উম্মু আসিমই উমর ইবনু আবদিল আযীয রাহিমাহুল্লাহকে তাঁর নানা উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু'র রঙে রাঙিয়ে তুলেছিলেন। [১]

আবদুর রহমান আন-নাসীর

তৃতীয় আবদুর রহমান। আন্দালুস অঞ্চলের শাসক (৯২৯-৯৬১)। তখন আন্দালুসে খুব সমস্যা- উত্তরদিক থেকে খ্রিষ্টানরা আক্রমণ করছে, এদিকে আফ্রিকায় ফাতিমীরা নতুন সাম্রাজ্য দাঁড় করাচ্ছে। ক্ষমতা নিয়ে আভ্যন্তরীণ কোন্দল। বাবাকেই হত্যা করেছে চাচা মুতাররিফ। এমন এক সময়ে তরুণ সুলতান ক্ষমতা গ্রহণ করেন। দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে সেনাবাহিনী রওনা করেন। এক যুদ্ধে ৭০টি দুর্গ বিজয় করেন। তারপর তিনি ফ্রান্সের রাজধানীর দিকে দৃষ্টি দেন। সুইজারল্যান্ডের ভেতরে প্রবেশ করেন। ইতালির প্রান্ত অবধি পৌঁছে যান। সব শাসকগোষ্ঠী তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। পুরো স্পেন-পর্তুগাল, দক্ষিণ ফ্রান্স, উত্তর ইতালি তাঁর দাপটে প্রকম্পিত। একটানা রাজত্ব করেন ৫০ বছর ছয় মাস। খিলাফতের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে যায় কর্ডোভা শহর। ইউরোপের রাজা-বাদশাহরা

স্থানীয় শত্রুর বিরুদ্ধে, অন্তর্কোন্দলে তাঁর সাহায্য চাইত। আর কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়তে আসত পুরো ইউরোপ। স্বনামধন্য উলামায়ে কেরাম এবং বিখ্যাত দার্শনিকরা সেখানে দারস দিতেন।

আবদুর রহমান ছিলেন ইয়াতীম। তাঁর বয়স যখন ২১ দিন তখন তাঁর চাচাতাঁর বাবাকে খুন করেছিল। তাঁর মা ছিলেন খ্রিষ্টান দাসী মুযনা। দাদিও ছিলেন খ্রিষ্টান, প্যামপ্লোনার রাজকন্যা। তাহলে বিপর্যস্ত মুসলিম শাসনকে এইভাবে শান-শওকতের চূড়ায় নেবার এই দক্ষতার পেছনে কী জাদু ছিল? সেই জাদুকর ছিলেন তাঁর ফুফু-'সাইয়্যেদা'। আবদুর রহমানের শিক্ষাদীক্ষা ছিল এই ফুফুর যিম্মায়। আর সুলতানের ব্যক্তিত্ব-বীরত্ব-জ্ঞানের কারিগর ছিলেন ইনিই। ।।

সুফিয়ান সাওরী

তিনি একই সাথে আরবের ফকীহ ও হাদীস বিশারদএবং তখনকার ছয়টি অনুসরণীয় মাযহাবের একটির প্রণেতাহাদীস শাস্ত্রে তিনি মুসলমানদের গুরু। তাঁর সম্পর্কে যায়িদাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সাওরী মুসলিমদের প্রধানতম ব্যক্তিত্ব।' ইমাম আওযায়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সুফিয়ান সাওরীই একমাত্র ব্যক্তি, বিশ্ববাসী বিনা দ্বিধায় যাঁর ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করে।' এই মহামান্য ইমাম এবং তাঁর অগাধ প্রজ্ঞা শুধুমাত্র তাঁর পুণ্যবতী মায়ের অবদান ইতিহাস আমাদেরকে তাঁর মায়ের নিদর্শন, সম্মান, তাঁর অবস্থান চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

ইমাম আবু আবদিল্লাহ আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সুফিয়ান সাওরীর মা তাঁকে বলেন, "বেটা, তুমি জ্ঞান অর্জন করোজীবিকার জন্য সুতার মেশিন নিয়ে আমিই যথেষ্ট।""' তিনি দিনমান কাজ করতেন জীবিকা নির্বাহের জন্য; যাতে সুফিয়ান সাওরী জ্ঞান সুযোগ পান।

তিনি তাঁকে নসীহতের মাধ্যমে প্রেরণা । ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, 'একদিন তাঁর মা তাঁকে বলছিলেন, "বেটা, তুমি ১০টি অক্ষর লেখার পর চিন্তা করবে তোমার ভেতরে আল্লাহভীরুতা, সহনশীলতা ও গাম্ভীর্য আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে কি না। যদি তুমি নিজের ভেতর এটি অনুভব করতে না পারো, তাহলে মনে রেখো এগুলো তোমার ক্ষতি ছাড়া উপকার বয়ে আনবে না।"

এখন যদি আমরা দেখি সুফিয়ান কীভাবে ইমাম সুফিয়ান সাওরী হয়েছেন, তাহলে এতে অসম্ভবের কিছু নেই। তিনি তো একজন আল্লাহওয়ালীর কোলে বেড়ে উঠেছেন। এমন আল্লাহভীরু, ইলম-প্রেমী, পরিশ্রমী মায়ের সন্তানের তো এমনই হবার কথা।

উপসংহার

উম্মাহর শেষ দূর্গ:

নারী ও পুরুষের দায়িত্ব ও অধিকার ইসলামে এমনভাবে ঠিক করা হয়েছে, যাতে তারা পাশাপাশি থেকে কাজ করতে পারে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে। একটি সুস্থ, সুখী ও প্রাণবন্ত পরিবারের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার এ সম্পর্ক থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে সন্তানদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে। একটি পরিবারকে সঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে স্বামী ও স্ত্রী, দুজনকেই সুষ্ঠুভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে। শিশুর সঠিক বিকাশের জন্যে বাবা-মা দুজনের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। পিতার ছায়া যেমন প্রয়োজনে তেমনি প্রয়োজন মা-র মমতাময় স্পর্শ। দুটোই সন্তানের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু আজ আমরা এ ভূমিকাগুলো উপেক্ষা করছি।

অনেক বিবাহিত দম্পতি সন্তানদের ঘরের অলংকার বা শোপিস-জাতীয় কিছু একটা মনে করেন। তারা সন্তান জন্ম দেন কারণ,

'সবারই তো বাচ্চা থাকে' অথবা,

'সন্তান তো থাকতেই হয় এটাই তো সমাজের রীতি...।'

তাদের কাছে সন্তান থাকাটা 'পরিপূর্ণ মানুষ' কিংবা 'সুখী দম্পতি' হওয়ার প্রমাণ। এর বেশি কিছু না!

এভাবে চিন্তা করার কারণে সন্তান জন্ম দেয়ার পেছনে গভীর কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য তাদের থাকে না। এই সন্তানদের নিয়ে তারা জান্নাতে ঢোকার স্বপ্নে দেখে না। নিজের সন্তানদের

দিয়ে উম্মাতে মুহাম্মাদীর নেককার বান্দার সংখ্যা তারা বাড়াতে চায় না। দ্বীন ইসলামের ওপর সন্তানকে বড় করার আগ্রহ-উদ্দীপনা তাদের মাঝে নেই।

একসময় তাদের কাছে সন্তানদের বোঝা মনে হয়। মনে হয় সন্তানেরা তাদের আটকে ফেলেছে। বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে ব্যক্তিগত আনন্দ, ক্যারিয়ারের উন্নতি, আর জীবনের অগ্রগতির পথে। সন্তানদের তারা দেখতে শুরু করে সুখ-শান্তি, শখ-আহ্লাদের পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে। এ ধরনের অভিভাবকেরা প্রায় নিশ্চিতভাবেই একসময় না একসময় সন্তানদের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে।

বাবা-মা তখন সন্তানদের অবহেলা করতে শুরু করেন। বুকের মাঝখানে তৈরি হওয়া সেই শূন্যতা পূরণের জন্য বাচ্চারা বুঝুঁকে পড়ে টিভি, মিডিয়া আর ইন্টারনেটের দিকে। তাদের চিন্তাচেতনা, আদর্শ ও আচরণ ঠিক করে দেয় মিডিয়া। তারা হয় আদর্শিক আগ্রাসনের সহজ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিকার।

নবীজি সন্তানদের প্রতি মনোযোগ দিতে বলেছেন এবং বলেছেন তাদের জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম হিসেবে গড়ে নিতে।

যেমন হাদিসে এসেছে,

إذا مات الإنسان انقطع عنه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلاثَةٍ : إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له।

যখন একজন মানুষ মারা যায় তাঁর সমস্ত নেক আমলের দুয়ার বন্ধ হয়ে যায়

[১৭] 'তোমরা অধিক সন্তানের প্রসবনী ও স্বামীদের অধিক ভালোবাসে এ ধরনের মেয়েদের বিবাহ কর, কারণ, (কিয়ামতের দিন) অন্যান্য উম্মাহর ওপর তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে আমি গর্ব করবো।'সুনান আবু দাউদ, ২০৫০

কেবল সাদকায়ে জারিয়া, উপকারী ইলম ও নেককার সন্তানের দু'আ তাঁর কাছে পৌঁছায়। [১৮]

আরেকটি হাদিসে এসেছে,

من كان له ثلاث بنات، فصبرَ عَلَيْهِنَّ، وأطعَمَهُنَّ، وسقاهُنَّ، وَكسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ، كُنَّ له حجابًا من النار يوم القيامة

যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা আছে এবং সে তাদের ধৈর্যধারণ করে লালনপালন করে, নিজ সম্পদ থেকে খাওয়ায়-পরায়, কিয়ামতের দিন সেই কন্যারা তাদের বাবা-মায়ের জন্যে ঢাল হিসেবে কাজ করবে এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে।১৯

হাদিসগুলো আমাদের মন-মননে ভালোভাবে গেঁথে নেয়া দরকার।

সন্তান হলো বাবা-মার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আপনি আসলে কেমন মানুষ, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ আপনার সন্তান। এবং তারাই হলো মৃত্যুর পর আপনার জন্য সাদাকায়ে জারিয়াহ।

সন্তানদের অবহেলা করে অন্য কিছুতে মনোযোগী হবার অবধারিত ফলাফল হলো তারা নিজেরা ধ্বংস হবে এবং পরিবার ও উম্মাহর ধ্বংসের উপকরণে পরিণত হবে। এর অসংখ্য উদাহরণ আজ আমাদের সামনে আছে।

আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

বলো, যারা নিজেদের আর নিজেদের পরিবার-পরিজনকে কিয়ামতের দিনে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। জেনে রেখো, এটাই হলো স্পষ্ট ক্ষতি। [তরজমা, সূরা আয-যুমার, ১৫]

পরিবার আজ উম্মাহর শেষ দুর্গ। আমাদের শত্রুরাও এটা জানে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল, রাষ্ট্র, সমাজ-সব জায়গা থেকে ইসলামকে অনেকাংশে সরিয়ে ফেলতে সফল হয়েছে তারা। কিন্তু আমরা এখনো নিজ ঘরের চার দেয়ালের ভেতরে পরিবারকে রক্ষা করতে এবং পারিবারিক বন্ধনগুলো দৃঢ় রাখতে সক্ষম। তাই তারা সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এ দুর্গ ভেঙে ফেলার। যদি এ দুর্গ টিকে থাকে তাহলে একদিন শত্রুর সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে হয়তো এর ভেতর থেকেই জেগে উঠবে উম্মাহর পুনর্জাগরণের মহিরুহ।

কিন্তু তার জন্য মেনে চলতে হবে আল্লাহর নির্ধারিত সীমাগুলো। নিজের পরিবারের হকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করতে হবে। তা না হলে শত্রুর চক্রান্তের চেয়ে আমাদের অবহেলাই আরও বড় বিপর্যয় ডেকে আনবে।

সন্তানদের অবহেলা করবেন না। তাদের উপেক্ষা করবেন না।
মনে রাখবেন, সময় এখন আর আগের মতো নেই।

আপনি যদি ওকে ভালোটা নাও শেখান খারাপটা কিন্তু ও নিশ্চিতভাবে শিখে যাবে। স্কুল, টিভি, ইন্টারনেট, গান, সিনেমা, সমাজ, সংস্কৃতি আপনার নিষ্পাপ বাচ্চাটাকে নিষ্পাপ থাকতে দেবে না। কলুষিত করে ফেলবে ওর চিন্তাকে।

সন্তানকে যদি ঈমান, আকিদাহ, আল্লাহর ভালোবাসা এবং তাকওয়ার শিক্ষা না দেন, তাহলে আপনার দেয়া নতুন পোশাক, হাতখরচের টাকা কিংবা রেখে যাওয়া সম্পদ ওদের কোনো কাজে লাগবে না। একদিন ঠিকই আল্লাহর সামনে ওরা আপনাকে দোষারোপ করবে। সন্তানের ভালো দিকগুলো খুজে বের করে চর্চার দ্বারা সেগুলোকে আরও গড়ে তোলা আপনার দায়িত্ব। তাদের স্বভাবের খারাপ দিকগুলো চিহ্নিত করে ধীরে ধীরে সেগুলো দূর করাও আপনার দায়িত্ব। আপনার সন্তানকে পবিত্র রাখার দায়িত্ব আপনারই।

হে অভিভাবকেরা শুনুন, ব্যস্ততার অজুহাত দেবেন না। এ অজুহাত আসলে নিজের সাথে প্রতারণা ছাড়া কিছুই না। রাসূলুল্লাহ-এর সাহাবী-গণ শুধু নিজ চাকরি, ব্যবসা কিংবা পরিবার নিয়ে চিন্তা করতেন না। তাদের চিন্তা করতে হতো পুরো পৃথিবী, পুরো মানবজাতির কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেয়া নিয়ে। কিন্তু তাঁরা এটাকে কখনো অজুহাত হিসেবে দাঁড় করাননি। বিশ্বজয়ের অভিযান থেকে ফিরে তাঁরা সন্তানদের সময় দিতেন। তাদের শিক্ষা দিতেন তাওহিদ এবং ওয়া আল ওয়ালা ওয়াল বারা-এর, কুরআন ও সুন্নাহর। দ্বীনি ইলম ও তাযকিয়্যাতুন নাফসের। দ্বীন ইসলামের বুঝ ও আদর্শের ওপর সন্তানদের গড়ে তুলতেন তাঁরা।

তাই অজুহাত দেবেন না। ওদের মধ্যে গড়ে তুলুন ঈমান আর ইসলামী মূল্যবোধ। উম্মাহর শেষ দুর্গটা যেন অবহেলায় হাতছাড়া হয়ে না যায়।

তথ্যসূত্র

বই:

*বিবাহপাঠ

*বিয়ে ও ডিভোর্স- ড. গওহর মুশতাক

*ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ২.০

*চিন্তাপরাধ

*আয়নাঘর

*সংসার ভাবনা

*আকাশের ওপারে আকাশ

ব্লগসাইট:

https://shamsularefin.com//

https://chintaporadh.com/

Muslimskeptic.com